প্রাতঃস্মরণীয়

তারকনাথ প্রামাণিক

নদীয়া জেলার চাকদহ-হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডপণ্ডিত ;
মেদিনীপুর জেলার সোনাখালী-হাইস্কুলের বর্ত্তমান হেডপণ্ডিত ;
চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুর অস্থলের সভাপণ্ডিত ;
শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ প্রণীত

অধুনাতন-রঙ্গালয়ের প্রখ্যাতনামা নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত ভূমিকা
ও
অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত দেবকুমার দত্ত এম-এ, কাব্যতীর্থ**
লিখিত অভিমত সংবলিত।

মূল্য বার আনা মাত্র

প্রকাশক :—
শ্রীক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য
গ্রাম বাসুদেবপুর, পোঃ শঙ্করপুর,
জেলা মেদিনীপুর।

মুদ্রাকর
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

Dedicated to

Babu Rakhaldass Pramanik

BY

Panchanan Ray Kavyatirtha

ভূমিকা

এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সাধারণতঃ পুস্তকের ভূমিকা লেখা হয় পাঠকবর্গের নিকট পুস্তক এবং লেখকের পরিচয় করিয়া দিবার জন্য। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে একরূপ নব আগন্তুক বলিলেই হয়। তাঁহার পরিচয় আমি যাহা দিব, তার চেয়ে বেশী পরিচয় পাইবেন তাঁর লিখিত পুস্তকে।

আলোচ্য পুস্তকখানি জীবনচরিত—মহাত্মা তারকনাথ প্রামাণিকের জীবনবৃত্তান্ত। গ্রন্থকার আমার পরম স্নেহভাজন—সুপণ্ডিত। আমি বালকবয়স হইতেই তাঁহাকে জানি। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাহিত্যে অশেষ অনুরাগ। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ছোটখাট প্রবন্ধ ও কবিতারচনা পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। ইনি বাঙলা দেশের গৌরবস্থল কবি কৃত্তিবাস ওঝা এবং কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বংশধর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন বাংলার প্রতি বর্ত্তমান লেখকের শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।

পুস্তকখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল—একটু সংস্কৃতঘেঁষা, তাহাতে বিষয়ের গাম্ভীর্য্য এবং গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার বয়সে নবীন হইলেও আদর্শে প্রাচীনপন্থী। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্পূর্ণ উপযোগী। বয়স্কেরাও পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইবেন। কলিকাতা সহরের তৎকালীন সমাজচিত্রও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্বর্গীয় মহাত্মা তারক প্রামাণিকের নাম আজকালকার তরুণেরা জানেন কিনা বলিতে পারি না; খুব সম্ভব জানেন না। আমি যখন পল্লীগ্রাম হইতে প্রথম কলিকাতায় আসি, তখনই বোধ করি তারকনাথ ২২।২৪ বৎসর স্বর্গগত হইয়াছেন। সে সময়েও কলিকাতার বদান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাঁর নাম সসম্মানে উচ্চারিত হইত। তাঁহার দান, দয়া এবং ব্রাহ্মণ-ভক্তির পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় আছে। এসম্বন্ধে যে সকল গল্প গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তাহার উপর আর একটী গল্প আমি বলিতেছি, ইহা আমি অন্যত্র শুনিয়াছি, এই গল্প সত্য হইলে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও মনের জোর কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা বুঝা যায়।

একবার তারকনাথের কোন এক পৌত্রের কঠিন অসুখ হয়; তারকনাথের পুত্র নিজের ছেলের জন্য যথাসাধ্য ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কয়েক দিন ধরিয়া বিপুল অর্থ ব্যয় হইল—কিন্তু রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। সেই সময় তারকনাথ তাঁর পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার সাধ্যমত তুমি চিকিৎসা করাইয়াছ।

এইবার আমার কথা শুনিবে?” পুত্র স্বীকার পাইলেন। তারকনাথ বলিলেন—“কিছু জরিমানা দিতে হইবে।” তিনি পুত্রের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণবিদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসা বন্ধ রাখা হইল। এমন-ই “দীয়তাং ভুজ্যতাম্” ব্যাপার আরম্ভ হইল যে, কার সাধ্য মনে করে বাড়ীতে কঠিন অসুখ! ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ তিনি ডাক্তারী ঔষধের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান্ মনে করিতেন। শুনা যায়, সে যাত্রায় তাঁহার পৌত্র রক্ষা পাইয়াছিলেন। তারকনাথের এই যে বিশ্বাস, এ বিশ্বাস প্রাচীন বাঙালীর বিশ্বাস। ইহার মধ্যে logic কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, তাঁহারা এইরূপই ভাবিতেন। দাশরথি রায়ের গান আছে—

“হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজঃ॥”

বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশ্বাস করিয়াছেন—

“দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ।”

ব্রাহ্মণসেবায় ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে অসম্ভব সম্ভব হয়।

যে মানুষের জীবনী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সেই ধরণের মানুষ, কি সহরে কি পল্লীগ্রামে, বর্ত্তমানে আর বড় দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলার জোর আছে কিনা জানি না, কিন্তু যখন একটা জাতি এই বিশ্বাস করে—তখন

আপনা হইতেই জোর হয়। প্রাচীন কালের খাঁটী বাঙালী বাংলা সমাজে আর নাই, সেইজন্য এই সকল চরিত্র চিত্রিত দেখিতে সবারই ভাল লাগে। আলোচ্য পুস্তকখানি এই কারণে সকলের ভাল লাগিবার কথা।

রাস-পূর্ণিমা
২২।৩এ, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
কলিকাতা।

সিটিকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র দত্তের পুত্র,

চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক,

শ্রীযুক্ত দেবকুমার দত্ত

এম-এ কাব্যতীর্থ, লিখিত অভিমত।

পরমকল্যাণীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমান্ পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, ৺তারকনাথ প্রামাণিকের একখানি জীবনেতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। গ্রন্থে প্রারম্ভিক কয়েকটি কথা উপন্যস্ত করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি, এই গ্রন্থের কয়েক ফর্ম্মায়, যে সকল তথ্য লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ও শ্রীমান্ পণ্ডিতপ্রবরের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, জীবনবৃত্তান্তের উপন্যাসপ্রণালী, সুললিত প্রাঞ্জল ভাষা প্রভৃতি অবলোকন করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি ; এবং তাঁহার সামান্য সামান্য, বিষয়েও ক্লেশ স্বীকারপরতার বিষয় অবগত হইয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীমান্ বঙ্গদেশের প্রাতঃস্মরণীয় আদিকবি কৃত্তিবাস ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বংশধর, *

---

* বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কর্তৃক এই বংশের রাজ্য অধিকৃত হইলে, ইঁহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। শ্রীমান্ পণ্ডিতপ্রবরের পূর্ব্বপুরুষগণ হাওড়া জেলার পেঁড়ো হইতে ধূলাগোড়ী, ম্যাল্লক প্রভৃতি স্থানে বাস করিবার পর, আজ দেড়শত বৎসর হইল মেদিনীপুর জেলায় ঘাঁটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত, গ্রামরত্ন বাসুদেবপুরে বসবাস করিতেছেন। এখানেও বিদ্যাসাগরের যুগে, ইঁহার প্রপিতামহ

কত মহাত্মাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশাল বঙ্গদেশে কে তাহা অবগত আছেন? মহাপণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ আজ কালবশে বিস্মৃত। দানবীর কৃষ্ণকান্ত রায়, উমেশচন্দ্র রায়, রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার কুমুদনাথ দত্ত, স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; কৃষ্ণকান্ত মাসান্ত ও মেদিনীপুরের দ্বিতীয় এম, এ, বি, এল পার্ব্বতীচরণ মাসান্ত অজ্ঞাত। নিজের ক্ষুদ্র জীবনেই কত অখ্যাত মহাপুরুষ দেখিলাম। মেদিনীপুরের পূজ্যপাদ রামরক্ষ তর্কতীর্থ, বারাণসীধামের পূজ্যতম গোপীমোহন কাব্যতীর্থ, বাসুদেবপুরের বদান্যবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, রাইন গোপালনগরের মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ, কলিকাতার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ প্রভৃতি মহাত্মগণ পুণ্যকর্ম্মে দীক্ষিত মহাপুরুষ। খুব কম লোকই ইঁহাদের পূতকীর্ত্তির সংবাদ রাখেন। প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ আত্মপ্রচারকামী না হইলেও, ইঁহার কীর্ত্তিগাথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ মুখরিত ছিল। সম্প্রতি কলিকাতার নাগরিকসভা, তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখস্থ পথটীর তাঁহার নামে নামকরণ করিয়া যেমন তদীয় স্মৃতি উজ্জ্বলতর করিয়াছেন, তেমনই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, তাঁহার স্মৃতি বর্ত্তমান দেশবাসীর মনে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত করিলে ধন্য হইব। এই কলিকাতা নগরীতেই কত অগণ্য মহাপুরুষ, গোপনে আপনাদের কীর্ত্তিরাজি বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্পর্কলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম বলিয়া আপনাকে

কৃতার্থ মনে করি,—এই সুযোগে তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তক মুদ্রণ ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক ও তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রাখালদাস প্রামাণিক মহোদয়গণ আমার আশীর্ব্বাদভাজন। স্বীয় পিতামহ, প্রপিতামহের কীর্ত্তি তাঁহারা উজ্জ্বলতর করুন, ইহাই প্রার্থনা। আমার ছাত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতা বেলগাছিয়াপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পশুপতি চক্রবর্ত্তীও মুদ্রণব্যাপারে কিছু পরিশ্রম করিয়াছেন। উভয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

অবশেষে, সুধীবৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা কৃপাদৃষ্টি দ্বারা দীন লেখককে উৎসাহিত করিলে, পরম উল্লসিত হইব। পূজনীয় পিতৃকল্প ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি মহোদয়, এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাকাল, আমার ও তাঁহার সেই অভিলাষ পূরণ করিতে দিল না। আমি তাঁহার নিকট যে কি পরিমাণে ঋণী, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না; স্থানান্তরে উহা বিস্তৃতভাবে জানাইবার চেষ্টা করিব।

জনৈক বৃদ্ধের অখণ্ডনীয় যুক্তিজালে, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতার নাম শান্তিরাম সিংহ লিখিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার নাম নন্দলাল সিংহ। শান্তিরাম ইঁহার পিতামহ ও সিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুদ্রণব্যাপারে প্রাথমিক দীর্ঘ-

সূত্রতা ও পরবর্ত্তী ক্ষিপ্রতা হেতু, দৃষ্টিবিভ্রমজাত কয়েকটী মুদ্রাকর ও অন্য প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে;—সহৃদয় পাঠক উহা মার্জ্জনা না করিলে আমি নিরুপায়। ইতি—

বিনীত

শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ

রাসপূর্ণিমা
তাং ১লা অগ্রহায়ণ বুধবার
সন ১৩৪৪ সাল।

ন্যায়ভূষণপাড়া
গ্রাম বাসুদেবপুর, পোঃ শঙ্করপুর
জেলা মেদিনীপুর।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক

প্রাতঃস্মরণীয়

তারকনাথ প্রামাণিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

কংসকার জাতীয় মাহিতা শ্রেণীর প্রামাণিক বংশের এক শাখা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মিরকালা সাহাগঞ্জ নামক স্থানে বাস করিতেন। ইঁহাদের আদি বাস কোথায় ছিল তাহা এখন স্থির করা দুরূহ; মিরকালা সাহাগঞ্জ হুগলী ও বাঙলার প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর সরস্বতী নদীতীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম* নগরীর সন্নিকট। সপ্তগ্রাম হইতে প্রাচীন যুগে বহু মালবাহী তরী বাণিজ্য উপলক্ষ্যে তাম্রলিপ্ত, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি ব্যবসায়-প্রসিদ্ধ স্থান ও জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দূরদেশে যাতায়াত করিত। ব্যবসায়ের

আদিবাস ও বাসস্থান পরিবর্ত্তনের কারণ।

---

* সপ্তগ্রাম বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগরের সমষ্টি বুঝায়; চৈতন্য চরিতামৃতে নিম্নোক্ত কবিতাটী আছে ঃ—

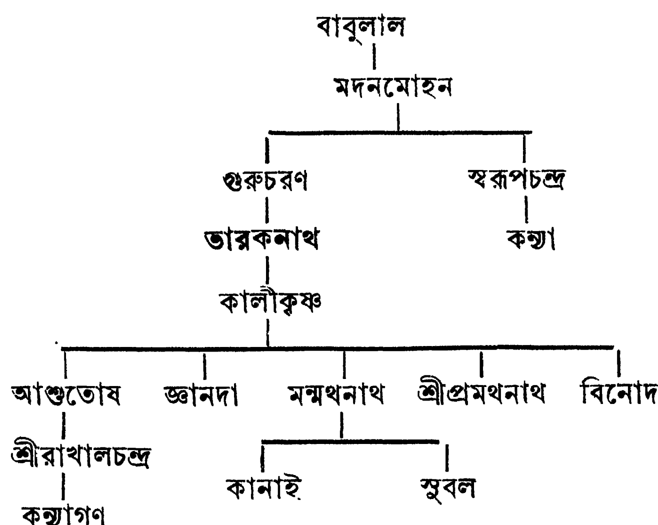
সপ্তগ্রামের বণিক্ সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসি' ধর্ম্ম অর্থ চতুর্বর্গ পায়॥

জন্য বিখ্যাত থাকায়, বহু বণিক্‌জাতি কর্ম্মোপলক্ষ্যে এখানে বা সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আপন আপন ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া, দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এখন সরস্বতী নদী মজিয়া এই স্থানের পূর্ব্ব-গৌরব লুপ্ত হইলেও কলিকাতা নগরীর উৎপত্তির বহুপূর্ব্বে, বাঙলার প্রসিদ্ধ গঞ্জ ছিল এই সপ্তগ্রাম; সপ্তগ্রামের অধঃ-পতনের পর বাণিজ্যলক্ষ্মী হুগলীতে স্থানান্তরিতা হন। পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত হইলে হুগলী বাণিজ্যপ্রধান স্থান হইয়া উঠে; সাহাগঞ্জ এই উভয় বাণিজ্য-কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ব্যবসায়ী কংসকারগণ এই স্থানকেই বসতি স্থাপনের জন্য মনোনীত করেন। পরে হুগলীরও ব্যবসায়-কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সকল ব্যবসায়ী জাতিই কলিকাতাভিমুখী হইয়া পড়েন।

সাহাগঞ্জে কে কি সূত্রে বসতি স্থাপন করেন এবং এই বংশের প্রকৃত অবস্থা সেখানে কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমান করা যায় যে, ইঁহারা সেখানে জাতীয় ব্যবসায়ই পরিচালনা করিতেন। কারণ পরবর্ত্তী সময়ে, কলিকাতা প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালে, যিনি কলিকাতায় উঠিয়া আসেন তিনি নিশ্চয়ই সপ্তগ্রাম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত কলিকাতার কয়েকটী আদি প্রসিদ্ধ বংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বাণিজ্যের উন্নতি উপলক্ষ্যেই আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বংশলতা ও বাবুলাল।

প্রামাণিকদিগের বংশলতায় আমরা মিরকাল্লা সাহাগঞ্জে বাবুলাল নামক এক ব্যক্তির নাম দেখিতে পাই ; এই স্থানে ইঁহাদের বংশ-লতিকাটী প্রদত্ত হইল।



মদনমোহন ও কলিকাতায় আবাস পত্তন।

বাবুলালের পুত্র মদনমোহনই খুব সম্ভব, কলিকাতায় বাস করিয়া বাসন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। কতদিন পূর্ব্বে মদনমোহন কলিকাতায় আসেন তাহা অনুমান করা শক্ত নহে ; বর্ত্তমান বংশধরগণ হইতে মদনমোহন ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ত্রিশ বৎসরে একপুরুষ ধরিলে প্রায়

মদনমোহন ও কলিকাতায় আবাস পত্তন

দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে মদনমোহন কলিকাতায় আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত জব চার্ণক কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ইহা নদীয়ার বিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে বিশ্ববিশ্রুত এই স্থান তখন কেবলমাত্র জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বহুলক্ষ টাকা রাজকর বাকি পড়ায় তিনি নবাব আলিবর্দ্দিখাঁকে তাঁহার জমিদারীর দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। নবাব স্বীকৃত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতার নিকট ভীষণ জঙ্গল দেখাইয়া সমস্ত বাকি রাজকর হইতে মুক্তিলাভ করেন। দূরদর্শী জব চার্ণক এই স্থানকেই রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণের উপযোগী স্থির করেন। সেই সময় ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কুঠী কলিকাতাতেও অবস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবার, সপ্তগ্রামের মল্লিক পরিবার ও যশোহর গোবিন্দপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, (বর্ত্তমানে ইঁহারা ঠাকুর নামে পরিচিত) এই সময় ব্যবসায়াদি সূত্রে কলিকাতার সূতানুটী গোবিন্দপুর (১) প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন।

(১) কলিকাতার তন্তুবায় জাতীয় বসাকদিগের সূতার নুটী শুষ্ক করিবার স্থান সূতানুটী নামে বিখ্যাত; উহা কলিকাতার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। এখনও বাগবাজারে নন্দরাম সেনের বিখ্যাত শিব মন্দিরে সূতানুটী নামটী খোদিত আছে। শেঠ পরিবারের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ

অনুমান সেই সময়েই মদনমোহনও বর্ত্তমান কাঁসারি-পাড়ায় বাস স্থাপন করেন।

একটী বাসন ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিতুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার হঠাৎ ধনী হওয়া সম্পর্কে একটা অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা তাঁহার কারখানার একটী মুচিতে ধাতু গলান হইতেছিল, এমন সময় জনৈক সাধু সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহার ভক্তিতে সাধু সন্তোষলাভ করিয়া অলৌকিক প্রভাবে মুচির সমস্ত গলিত ধাতু সুবর্ণে পরিণত করিয়া দেন। মদনমোহনের প্রায় সমসাময়িক গৌরীসেনও এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে প্রচুর ধনলাভ করেন; তিনি রাঙতা বোঝাই কয়েকটী নৌকা মেদিনীপুরের এক স্থানে প্রেরণ করেন, অলৌকিক উপায়ে নৌকার সমস্ত রাঙতা রজতে পরিণত হয়। প্রেরক ভুল করিয়াছেন মনে করিয়া ধার্ম্মিক গ্রাহক তাহা ফেরত পাঠাইয়া দেন। দেবতার কৃপায় মুগ্ধ গৌরীসেন, রজত বিক্রয়লব্ধ সমূহ অর্থ দানে ব্যয় করিতে

মদনমোহনের কারখানা স্থাপন ও অলৌকিক উপায়ে ধনলাভ ; গৌরীসেনের কাহিনী।

গোবিন্দজীর নাম হইতেই বর্ত্তমান কলিকাতার দক্ষিণাংশের কিয়দংশের নাম গোবিন্দপুর হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানে বারাণসীধামের চৌখাম্বার প্রখ্যাত মিত্র বংশের জনৈক গোবিন্দ মিত্র নামক ব্যক্তির নামই গোবিন্দপুর নাম করণের হেতু।

অভিলাষী হইয়া বিবিধ সৎকার্য্য সাধন করিতে আরম্ভ করেন।. প্রার্থী তাঁহার নিকট কখনও বিফলমনোরথ হইত না। কেহ কোন সৎকার্য্য আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে, তিনি অর্থ সাহায্যে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিতেন। এই ঘটনা হইতেই এতদ্দেশে "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন" নামক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। (১) আধুনিক রুচির মানবগণ হয়ত এই ঘটনাটীকে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে মহাকবি সেক্ষপীয়রের "There are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your Philosophy"(২) এই মহা বাণীটীর মর্ম্ম অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। জন্মান্তরের সাধনার ফলে মনুষ্য ইহজগতে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভ করে। দেখা যায়, কেহ কোন কর্ম্মবিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইতেছে, আবার কেহ অতি অল্প যত্নেই সফলতা লাভ করিতেছে। অনুধাবন করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্ব জন্মের সাধনাই ইহার কারণ, উক্ত সাধনার ফলেই মানব ইহজগতে বিবিধ মহৎ বিষয়ের প্রবর্ত্তক হয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাস্ত্রে আছে, "পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিতা বিদ্যা, ধন ও পুণ্য অগ্রে

(১) ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২০।

(২) Shakespeare, Hamlet I act. scV.

অগ্রে গমন করিয়া থাকে।” (১) ইহজীবনে মানবের হঠাৎ ধন প্রাপ্তির মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা কাকতালীয়তারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না, পরন্তু এই প্রাপ্তির বীজীভূত কারণ যে তাহারই আত্ম-সাধনা তাহাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। বিশ্বপ্রকৃতি সমদর্শিনী; তিনি পক্ষপাতিতা দ্বারা কাহাকেও ধনী বা কাহাকেও দীন করেন না। মানব আপন তপস্যা বা কর্ম্মপ্রভাবে অবস্থা বিপর্য্যয় লাভ করেন। মদনমোহন এক মহৎ বংশের প্রবর্ত্তক; উত্তরকালে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার বংশকে পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষকে লাভ করিবার অধিকার, মদনমোহন তাঁহার স্বকীয় সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করেন। যাঁহারা জগতে মহৎ কার্য্য সমাধা করেন, ঐশীশক্তির প্রভাবে তাঁহারা অনেক অলৌকিক বিষয়েরও অধিকারী হন, অনেক অদ্ভুত অতিলৌকিক পদার্থও তাঁহাদের আশ্রয়ে উপস্থিত হয়। প্রবাদ আছে, এক ব্রহ্মদৈত্য মদনমোহনের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন; একটী বাস্তুসর্প মূর্ত্তিমান্ কল্যাণরূপে তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করিত; চাণক্য সসর্প গৃহে বাস মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই দেশের বনিয়াদী গৃহস্থগণের অনেকের বিশ্বাস, বাস্তুসর্প গৃহস্থের মঙ্গলকারক। এইরূপ বাস্তুসর্প বিনাশ করিয়া অনেক বংশ লুপ্ত হইয়াছে

---

(১) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥

বলিয়া শোনা গিয়াছে ; শাস্ত্রে আছে, সর্পশাপে সন্তানসন্ততি বিনষ্ট হয়।* সর্প বংশবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কাঁসারী-পাড়ার বাসভবনের পশ্চিমাংশটী মদনমোহনের আমলে নির্ম্মিত। তাঁহার জীবনের আর কোনও ঘটনা বর্ত্তমানে জানিবার উপায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ প্রামাণিক, তদীয় ব্যবসায় ও দেবতা স্থাপন।

মদনমোহনের দুই পুত্র গুরুচরণ ও স্বরূপচন্দ্র। স্বরূপ চন্দ্রের বংশ বর্ত্তমানে লুপ্ত। তাঁহার সম্পত্তির অংশ তাঁহার কন্যা অপর অংশীদারগণের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। মদনমোহন কলিকাতায় বাস করিয়া যে কারখানাটী স্থাপন করিয়াছিলেন গুরুচরণ তাহার প্রভূত উন্নতি-সাধন করেন। ইনি চাঁদনীতেও দুইটী বাসনের দোকান করিয়া কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করেন ; ইহা ছাড়া হাওড়া শালিখার গঙ্গাতীরে Caledonia Dock নামক একটী জাহাজ মেরামতি কারবার আরম্ভ করেন। খিদিরপুর ডক নির্ম্মাণ হইবার বহু পূর্ব্বে

---

* সর্পশাপাৎ সুতো নষ্টঃ।

এই বিখ্যাত ডকটী প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কলিকাতা বন্দরে সমাগত পোতসমূহের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও বাষ্পীয় যানের বহুল প্রচলন হয় নাই—অধিকাংশ জাহাজ একমাত্র পাল ও হালের সাহায্যে প্রবহমান বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া গমনাগমন করিত। সমুদ্রে নিমজ্জিত অজ্ঞাত চুম্বক পর্ব্বতের আকর্ষণ হইতে তরণী রক্ষার নিমিত্ত, প্রত্যেকের তলদেশে তাম্র কিংবা পিত্তলের চাদর লৌহ চাদরের পরিবর্ত্তে আবরণরূপে ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘ ভ্রমণের পর ঐ চাদরগুলির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িত। এই পরিবর্ত্তন কার্য্য সাধন করিয়া ডককর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট লাভবান্ হইতেন। তৎকালে এইটীই ছিল বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ডক। খুব সম্ভব ভবিষ্যতেও আর কোন ভারতীয় বা বঙ্গদেশবাসী এইরূপ ডক্ প্রতিষ্ঠা করিয়া জাহাজ মেরামত কার্য্য পরিচালনা করেন নাই। তাই গুরুচরণকেই প্রথম ডক্ প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গদেশবাসী আখ্যা দান করা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটীই ছিল গুরুচরণের লক্ষ্মী: কারণ অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা, ইহা হইতেই তিনি অপরিমিত মুদ্রা লাভ করিতেন। এই সকল ব্যবসায় ব্যতীত গঙ্গাধর সরকারের সহযোগে, কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে তিনি একটী কাষ্ঠের আড়ত প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে ব্যবসায় কার্য্য পরিচালনা করিয়া তিনি উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এই মহাবাক্য, তাঁহার উদ্যোগে

ক্রমে, ক্রমে, সার্থকতা লাভ করিতে লাগিল। অভ্যুদয় নবারুণোদয়ের মতই তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতে থাকিল। ক্রমে স্বীয় পিতার নির্ম্মিত বাসভবনের পূর্ব্বাংশে তিনি একটি বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। পৈত্রিক বাটীর ত্রিতলে শ্রীধর নামক শালগ্রাম স্থাপন করিয়া তাঁহার নিত্য পূজার সুব্যবস্থা করিলেন। যথারীতি নৈমিত্তিক উৎসবসমূহ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

পিত্তল নির্ম্মিত একটী সুঠাম রথ প্রস্তুত করাইয়া তিনি স্বীয় দেবতার রথযাত্রা উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। কলিকাতা অঞ্চলে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুদৃশ্য রথ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই রথটী তাঁহার বাটী হইতে বড় বাজার অবধি গমন করিত। এই রথযাত্রা উৎসবের সময়, একদা তাঁহার ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তির একটী সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়।

রথযাত্রা উৎসব ও অলৌকিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তি।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে,— রথ তখন বড়বাজার হইতে গৃহাভিমুখী; বহু অভুক্ত অনুচর রথের অনুগমন করিতেছেন। তাঁহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিবার জন্য গুরুচরণ অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য! সামান্য মাত্র ভোজ্যদ্রব্যও গৃহে মজুত নাই; সকলে তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক কক্ষ অন্বেষণ করিয়া লেশ-মাত্রও ভোজ্য না পাওয়ায়, গুরুচরণ ঐকান্তিকভাবে ভগবচ্চিন্তায় রত হইয়া ঠাকুর দালানে শয়ন করিলেন। বহু

ব্যক্তি সমাগত প্রায়, ভোজনের কোন ব্যবস্থাই নাই, ভক্তিমান্ গুরুচরণ তদ্গতচিত্তে দেবতার কক্ষে খাদ্য অন্বেষণ করিতে আদেশ দিলেন; পূর্ব্বেই সেই কক্ষও অন্বেষিত হইয়াছিল তাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকজন সেই স্থান অন্বেষণ করিতে গেলেন; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পূর্ব্বে যেখানে সামান্য পরিমাণ খাদ্যও ছিল না, এবারে তাঁহারা সেখানে প্রচুর লুচি ও অন্যান্য বিবিধ খাদ্য দেখিতে পাইলেন। হর্ষোৎফুল্ল মানসে সকলে গুরুচরণকে সেই সংবাদ দিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি পার্শ্বচরগণকে ভোজনের ব্যবস্থা করিবার আদেশ করিলেন। ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত অনুচরবর্গ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে করিতে, গুরুচরণের অতিলৌকিক ক্ষমতার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। "একাগ্রচিত্তে যিনি ভগবানের চিন্তা করেন ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার সকল দিক্ রক্ষা করেন," এই মহৎ উপদেশটী আমরা অমূল্য গ্রন্থ গীতা (১) হইতে পাইয়া থাকি। সুতরাং পরম ভক্ত গুরুচরণের সম্পর্ক-যুক্ত পূর্ব্ববর্ণিত কাহিনীটীতে আমাদের অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তের বিভূতিসম্পর্কীয় এইরূপ শত শত কাহিনী উল্লিখিত আছে।

---

(১) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গুরুচরণের বনাত বিতরণ ও আশ্চর্য্য তিরোধান

গুরুচরণের বনাত গায়ে দেওয়ার কাহিনীটী একটী জনপ্রবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে; উহা সর্ব্বত্রই বহুজনবিদিত। প্রবল শীতের সময়ও গুরুচরণ একটি নামাবলী মাত্র গায়ে দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তখন তিনি প্রচুর বিভবশালী কিন্তু, তত্রাচ, একটী শীতবস্ত্র ক্রয় করিবার স্পৃহা তাঁহার হয় নাই। এই অবস্থায় একদা গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময়, তাঁহাকে শীতে কম্পমান দেখিয়া সিংহীবাজার পল্লী-নিবাসী বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা শান্তিরাম সিংহ মহাশয়, উপহাস ছলে বলেন, "গুরুচরণ! তুমি তো এখন বেশ রোজগার করিতেছ, তবুও কি একটা বনাত কিনিয়া গায়ে দেওয়ার সামর্থ্য তোমার হয় নাই?" গুরুচরণ মৃদুহাস্য করিয়া "সত্বর গায়ে দিব ভাবিতেছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন পুত্র তারকনাথের নিকট শান্তিরামের উপহাস-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। অনন্তর পুত্রের পরামর্শে বনাত গায়ে দেওয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। শুভদিনে ত্রিংশ সহস্র মুদ্রার শীতবস্ত্র ক্রীত হইয়া ভাগীরথী তীরে বহু সহস্র ব্রাহ্মণকে বিতরণ করা হইল; দাতার সবিনয় অনুরোধে, ব্রাহ্মণগণ শান্তিরামের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ রক্তিমাভ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সিংহ মহাশয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন। তিনি বুঝিলেন, প্রকৃত সনাতনধর্ম্মী অপরকে সুখী

গুরুচরণের বনাত বিতরণ।

করিয়া তবে নিজের সুখ প্রত্যাশা করে। আজ এই ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সাম্যবাদের যুগে ভাবপ্রবণ যুবকবৃন্দ, যাঁহারা হিন্দুর সকল রীতিনীতিকেই একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা হিন্দুর এই প্রাচীন লুপ্ত লোক-ব্যবহারগুলির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন। অতীত যুগে নৈষ্ঠিক হিন্দু অপরকে বঞ্চিত করিয়া কখনই আত্মসুখ চাহিতেন না। অপরকে সুখী করিয়াই তিনি সুখবোধ করিতেন। পুণ্যশ্লোক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পিতা, স্বীয় অসুস্থতার সময়ে কোন বস্তু খাইবার অভিলাষ হইলে, ব্রাহ্মণদিগকে তাহা ভোজন করাইয়া স্বকীয় ভোজনস্পৃহা পূর্ণ করিতেন। বর্ত্তমান যুগে বৈদেশিক ভাবমত্ত আমরা যতই আপনাদের প্রাচীন আচার হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি, ততই আমাদের সম্মুখের পথ অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে। সমাজের দোষ বিদূরিত হউক, কিন্তু আমাদের শুভকরী পুরাতন রীতি আমরা পরিত্যাগ করিব কেন? আত্মসুখমত্ত আধুনিক ধনিবৃন্দ উপরোক্ত কাহিনী হইতে আপনাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ করুন।

গুরুচরণের আশ্চর্য্য তিরোধান।

গুরুচরণের তিরোধানও এক অবাস্তব ঘটনার ন্যায়; পৌত্রীর শোকে একাদিক্রমে ছয়দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। শেষ সময়ে তিনি লাল-পেড়ে শাড়ী ও সিন্দূর পরিশোভিতা পুত্রবধূকে দেখিতে ইচ্ছা করেন; উপযুক্ত বেশে তিনি উপনীতা হইলে

গুরুচরণ একটী মুদ্রাপূর্ণ বাক্স তাঁহাকে উপহার-স্বরূপ দান করেন। কথিত আছে, মহাত্মার আশীর্ব্বাদে উক্ত মুদ্রাধার কখনও শূন্য থাকিত না। শেষ অভিলাষ পূরণের অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার আত্মা ভগবল্লীন হয়। তাঁহার অসীম পুণ্যের ফল-স্বরূপ একমাত্র পুত্র তারকনাথ, তখন, স্বকীয় গুণ-প্রভাবে উদীয়মান তপনের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। যথানিয়মে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্মশানঘাটে তিনি পিতার সৎকার ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

গুরুচরণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

অনন্তর যথোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এই কার্য্যে তাঁহার পুত্র সার্দ্ধলক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। অগণ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিজ নিজ মর্য্যাদার অনুরূপ বিদায় ও তৈজস প্রাপ্ত হন; দরিদ্রগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া উপযুক্ত বিদায় দান করা হয়। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে প্রতিবেশিগণের গৃহে একপক্ষ কাল রন্ধন হয় নাই। এই সময় বাজারে সমানীত সমূহ-দ্রব্য ক্রয় করিয়া লওয়া হইত; ইহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে—"এই প্রকারে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়া যায় যে, গুরুচরণের শ্রাদ্ধের পর হইতেই দ্রব্যমূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারকনাথের জন্ম ও সিমলা পল্লীর বিশেষত্ব।

সন ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন (ইং ১৮১৬) কলিকাতার সিমলা-পল্লীস্থ কাঁসারী পাড়ার ভবনে তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা নগরীর এই সিমলা পল্লীর নানাদিকেই একটা বিশেষত্ব আছে, দেশবিখ্যাত বহু মনীষী এই পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল, মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত, প্রথম বেলুন-চালক রামচন্দ্র বসু প্রভৃতি বিখ্যাত মানবগণের জন্মস্থান এই পল্লী। বর্ত্তমান যুগেও এই পল্লী কলিকাতার ভিতর আপনার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—এই নাস্তিকতার যুগেও এই পল্লীতে কয়েকটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের কোন কোনটী নির্ম্মাণ করিতে সার্দ্ধলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। তারকনাথের জন্মে তদীয় পল্লীর সেই বিশেষত্ব মাত্র রক্ষিত হয় নাই, পরন্তু উহার গৌরব বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জন্মকাল ও যুগপ্রভাব, তারকনাথের নির্লিপ্ততা।

যে যুগে তারকনাথের জন্ম হয় তাহা বঙ্গদেশের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য যুগ। চারিশত বৎসরের অধিক কাল মুসলমানাধিকারে বাস করিয়া এতদ্দেশবাসিগণের মন যেভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—এই সময় তাহার

পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায়। ভাববিজয়িনী পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পর, এই সময় বঙ্গদেশে বিচিত্রভাব-বিপ্লব উদ্ভূত হইয়া সনাতন সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের প্রচেষ্টায় অনেক গণ্যমান্য বংশের যুবক তাঁহাদের কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। পাদরী কৃষ্ণমোহন, মাইকেল মধুসূদন ও রামবাগান দত্ত পরিবারের কয়েক জন ইঁহাদের অগ্রণী। হিন্দুকলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এই সময় একটী আলোচনা সভা স্থাপিত করিয়া, নব্য যুবকদিগকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরাগভাজন করিয়া তোলেন। এই সভাস্থাপনের অল্পদিন পরেই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বহু বিখ্যাত বঙ্গবাসী উক্ত সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'ন। প্রায় একই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বামী দয়ানন্দ আর্য্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। এতদ্দেশীয় বহু হিন্দু যুবক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদীয় ধর্ম্মসমাজভুক্ত হ'ন। এইরূপে নানা উপধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মরূপ মহামহীরুহকে বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে। এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা স্বধর্ম্মে পরমানুরাগী থাকিয়া গেলেন সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহারা সকলের নমস্য। মনীষী ভূদেবচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র হইলেও স্বীয় পিতার পুণ্যপ্রভাবে স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ থাকিয়া গেলেন। পরিবর্ত্তনের প্রথম সূচনাতেই তাঁহার পুণ্যাত্ম-পিতা সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া



৺কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক

তাঁহার মতি স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহোদয় ও অপর কয়েকজন দেশবিখ্যাত মনস্বী এই ধর্ম্মবিপ্লবের যুগেও আপনাপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ উহাঁদের অন্যতম; স্বধর্ম্মে ও সদাচারে তাঁহার এরূপ আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল যে, তাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ বলিয়াই মনে হইত না। যুগে, যুগে, সনাতনধর্ম্মরূপ বিশাল প্রাসাদকে এই সকল শ্রদ্ধাবান্ ধার্ম্মিক মহাপুরুষই সুদৃঢ় স্তম্ভসমূহের মতই ধারণ করিয়া থাকেন।

জন্মকাল ও বিখ্যাত ব্যক্তিগণের আবির্ভাব।

আরও একটী বিষয়ে তারকনাথের জন্মকাল উল্লেখ-যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর এতদ্দেশীয় শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ, এই সময় জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গজননীর বদনকমল গৌরবোজ্জ্বল করেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন এক-একটী বিশেষ যুগকে আশ্রয় করিয়া অনেকগুলি মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন। উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে; উক্তযুগে অল্পবিস্তর সময়ের ব্যবধানে জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক পার্শ্বনাথ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌতম, প্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ চাণক্য, শব্দজ্ঞ পাণিনি, বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি অতি-মানব ধরাতলে অবতীর্ণ হ'ন। ইঁহারা কেবলমাত্র ভারতের নহে, পরন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত। ইঁহাদের সহিত তুলনা

করিবার যোগ্য না হইলেও, মহাত্মা তারকনাথের অল্পবিস্তর পূর্ব্বে বা পরে যে সকল মনীষী বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন ইতিহাসে তাঁহাদের একটা বিশেষ স্থান থাকিবে। নিম্নোক্ত মনীষিগণের জন্মকালের সহিত তুলনা করিলে তারকনাথের জন্মকালের বিশিষ্টতা অনুভূত হইবে।

পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্ট শৃঙ্গ আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদার ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে, বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সকল মহাত্মার জীবনী বঙ্গদেশের ইতিহাসের এক একটী বিশেষ পরিচ্ছেদ। ইঁহাদের সম-শ্রেণীর না হইলেও, অন্যদিকে তারকনাথের একটী বিশেষত্ব আছে এবং এই জন্যই তিনি ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য—তাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে ইহা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

তারকনাথ পিতার একমাত্র পুত্র,—পিতৃসম্পদ-বৃদ্ধির প্রাক্‌কালে তাঁহার জন্ম, তাঁহার জন্মের পর হইতেই এই পরিবারের লক্ষ্মীশ্রী বর্দ্ধনশীলা হইতে থাকেন; সুতরাং তিনি

শৈশবকাল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

"পয়মন্ত" ছেলে বলিয়া পরিবার মধ্যে তাঁহার আদর হওয়া স্বাভাবিক; বিশেষতঃ একমাত্র পুত্র চিরকালই আদরের পাত্র। কিন্তু

মহাপুরুষদিগের গতিপথ স্বতন্ত্র; মাতাপিতার আদরে তারকনাথ বিচলিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যচ্যুত হ'ন নাই। শৈশব হইতেই স্বীয় করণীয় বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ ছিল। বিভবশালী ব্যক্তিগণের বংশধরগণ সাধারণতঃ বাল্যকাল হইতেই কর্ত্তব্যকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন; তাঁহাদের অভিভাবকগণও বিত্তশালিত্ব বশতঃ উহা বিশেষ দোষের দৃষ্টিতে দেখেন না; কিন্তু এই ক্ষেত্রে উক্ত প্রথা বৈপরীত্য আশ্রয় করিয়াছিল। গুরুচরণ আপন পুত্রকে মানুষ করিবার জন্য যত্নের ক্রুটি করেন নাই। তারকনাথও গুরুজনগণের আদেশ অমান্য করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুতি প্রদর্শন করেন নাই।

বাল্যশিক্ষা ও ব্যবসায়ে প্রবেশ।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তারকনাথ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দ্বাদশ বৎসর অবধি তিনি এই পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া আপনার পৈত্রিক ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শিক্ষাদান-সাহায্যে অভ্যন্তরীণ বৃত্তিনিচয়কে বিকশিত করিবার চেষ্টা করা হয় না। ফলে বিভিন্নমুখি-প্রবৃত্তির মানবমণ্ডলীকে একই ছাঁচে ঢালিবার প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। যে মানবের স্বাভাবিক প্রবণতা, যে বিশেষ ক্ষেত্রের দিকে, তাহাকে সেই পথে পরিচালিত করিলে, সে সহজেই সেই শিক্ষণীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাদানের এই সুন্দর নীতিটী অনুসরণ করিয়া গুরুচরণ তারকনাথের

এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি ভবিষ্যতে আপনার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য, সাধারণভাবে কতকটা প্রাথমিক শিক্ষা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় ;—তারকনাথকে সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষাও প্রদান করা হইয়াছিল। অতিমানবগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের অনেকেই বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষায় খুব কমই বিকশিত হইতে দেখা যায়। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি প্রবল বিঘ্নাদির মধ্যেও আপনার গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া ল'ন। প্রাচীন যুগের বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকার,কৃষ্ণপান্তি, মতিলাল শীল প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বিদ্যালয়ে প্রস্তুত হ'ন নাই; আত্মসাধনার বলে স্বীয় প্রকৃতির একটী বিশেষ শক্তিকে বশ করিয়া আপনার অভীপ্সিত কার্য্যে নিয়োগ পূর্ব্বক তাঁহারা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। মানব যে পথে উন্নতি লাভ করিবে অতি বাল্যকাল হইতেই সেই পথ আশ্রয় করিলে তাহার পরিণামে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধিলাভ; প্রতীচ্য ব্যবসায়িগণ সমুন্নতিকামী মানবকে অতি শিশু অবস্থা হইতেই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বনিম্নকর্ম্মে নিযুক্ত করেন। পরে ঐ শিশু ক্রমোন্নতি প্রভাবে, কালে, বিখ্যাত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য হ'ন। পাশ্চাত্ত্য দেশে বহু বিখ্যাত ব্যবসায়ীর জীবন এইভাবে গঠিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ

রকফেলার * মিঃ হেনরী ফোর্ড † প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনবান্‌গণ এইভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তারকনাথও এইরূপ, মাত্র দ্বাদশবর্ষ-বয়সে, পিতার ব্যবসায়-পদ্ধতি শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীবান্ মহাপুরুষ অল্পদিনের মধ্যেই পিতার ব্যবসায়-নীতি আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ক্রমে আত্মবুদ্ধিবলে তিনি

ব্যবসায়-পরিচালনা কৌশল।

পৈত্রিক ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক-পরিচালনায় পিতার স্বল্পপরিসর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশালতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কর্ম্মক্ষেত্র ধীরে, ধীরে, বিস্তৃততর হইতে লাগিল। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী প্রশস্ততর পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তারকনাথ পৈত্রিক দোকানগুলিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ব্যবসায়কে আরও বর্দ্ধিতাকারে

* সম্প্রতি ৯৭ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

† আমেরিকাবাসী মোটর ব্যবসায়ী—বর্ত্তমান যুগে ইনিই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

পরিচালনা করিবার জন্য তিনি চাঁদনী ও বড়বাজারে আরও কয়েকখানি নূতন দোকান স্থাপন করেন। এই সকল দোকানের কার্য্যভার নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এক একটী দোকানের ভার এক একজন কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হয়; তারকনাথ কেবল মাত্র তাঁহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং প্রয়োজন মত কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতেন। কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট নিজ পরিবারভুক্ত স্বজনগণের ন্যায় অতি-প্রিয়জন ছিলেন ও প্রত্যেকে তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সুমধুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেন যে, কার্য্যক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা, যাঁহার প্রতি যে প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত ছিল তিনি সেইটীকে, আপনার একান্ত নিজস্ব ভাবিয়া, উহার সম্যক্ উন্নতি বিধানের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। প্রধান কর্ম্মচারিগণের ভিতর একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসিয়া পড়িত এবং প্রত্যেকেই আপনার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানটিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক প্রমাণ করিতে চাহিতেন; ইহার বিনিময়ে প্রভুর অধিকতর প্রিয় হওয়াই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তারকনাথ স্বীয় পরিচালনা-কৌশলে এই প্রকারে অল্প আয়াসে, অধিক লভ্যাংশের অধিকারী হইতেন। কর্ম্মচারিগণও যোগ্যতার অনুরূপ পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইত না।

শালিখায় পূর্ব্বে যে ডক ছিল উহা শ্লিপ ডক নামে কথিত হইত; তারকনাথ সন ১২৫৯ সালে "রবার্ট প্রামাণিক" নামকরণ করিয়া উক্ত শ্লিপ ডককে গ্রেপিং ডক রূপে পরিণত করেন। জাহাজ মেরামত ও পূর্ব্বোক্ত পিত্তল ও তাম্র চাদর পরিবর্ত্তন ডকের প্রধান কার্য্য ছিল। ঐ কার্য্যের জন্য তারকনাথ কতিপয় ডুবুরী প্রতিপালন করিতেন; জাহাজ ডকে উপস্থিত হইলে উহারা ডুবিয়া জাহাজ ডকে ঠিক ভাবে বসিল কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিত; এই কার্য্য করিবার সময় এক এক দিন, কোন কোন, দুর্ভাগ্য ডুবুরীর হস্তে জাহাজ চাপিয়া বসিয়া গিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিত। এই ডকের কার্য্যে তারকনাথের বিপুল ধনাগম হইত, কোন কোন সময় ইহাতে অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লব্ধ হইত। ডকের তলভাগস্থ মাটীতে বহু পিত্তল ও তাম্রের পেরেক প্রকৃতি পতিত হইত। উক্ত মাটী বিক্রয় করিয়াও মালিকগণ কিছু মুদ্রা লাভ করিতেন।

ব্যবসায় বর্দ্ধন ও শালিখার ডক।

কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে গুরুচরণ যে কাষ্ঠের ব্যাবসায়টির পত্তন করেন তারকনাথের উদ্যমে উহা বর্দ্ধিতাকারে পরিচালিত হইতে থাকে; ক্রমে তিনি বিলাতে তাম্র ও পিত্তলের চাদর রপ্তানী করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিতে হইয়াছিল। জাহাজ

কাষ্ঠগোলা ও অন্যান্য ব্যবসায়।

দুইখানিতে এতদ্দেশজাত তাম্র ও পিত্তলের চাদর বোঝাই হইয়া, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। নীতিশাস্ত্রে আছে, "যিনি আপনার সামান্য অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকেন, বিধাতা তাঁহাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া, তাঁহার সম্পদ বৰ্দ্ধিত করেন না।" অনন্ত শক্তির উৎস ভগবান প্রত্যেক মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত, অতএব সকল মানবকেই মহাশক্তির আধার বলা যাইতে পারে। যিনি এই অফুরন্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি কখনই আপনার সীমাবদ্ধ অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না; তাই আমরা দেখিতে পাই, গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত বীর ওডিসিয়ুস অতৃপ্ত হইয়া আরও—আরও—অজ্ঞাতের সন্ধানে ধাবিত হইতেছেন। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহ সুদূর—সুদূর—দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সাধারণ মানব, মনে, এই প্রেরণা পায় নাই, তাই কূপ-মণ্ডূকতাই তাহার প্রিয় হয়। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অতিমানব আপনার অফুরন্ত শক্তির বেগ অসীমের পানে চালাইয়া অতৃপ্তির মাঝেই তৃপ্তি লাভ করে। সরল স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনই এই প্রকৃতির মানবের নিকট দুর্ব্বহ—জীবন-সমরাঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়াই তাহার অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ হয়। আরব্য উপন্যাসের অন্যতম নায়ক সিন্দাবাদ গল্পটীতে, আমরা এই প্রকৃতির মানবের সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই—ভোগবিলাস ও গতানুগতিক জীবনের অনবীকৃতত। সিন্দাবাদের নিকট অতৃপ্তিজনক ছিল,

তাই বারংবার সমুদ্রযাত্রায় উপর্য্যুপরি বিপদজাল অতিক্রম করিয়াই তিনি বিপুল তৃপ্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বে বাসনার শেষ নাই সত্য, কিন্তু মানব সংযমক্ষম হইয়া বাসনার রজ্জু যতই উন্মুক্ত করুন না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই—সময়ে প্রয়োজন মত রজ্জু সংহরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় না, পরন্তু এই শিথিলতার অবসরে তিনি যাহা লাভ করেন, তাহা পরার্থে প্রয়োজিত করিয়া জগতের মহদুপকার সাধন করিতে পারেন। এই কারণেই তারকনাথের ব্যবসায়-বর্দ্ধন-সঙ্কল্প যুক্তিসিদ্ধ; দিনে, দিনে—ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিতে থাকায় তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল। তিনি কলিকাতায় বহু জমি ও বাটী ক্রয় করিতে লাগিলেন; কালে তিনি কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়িগণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইলেন; এই সময় ব্যবসায় হইতে তাঁহার বাৎসরিক আয় তিন লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত হইত। বড়বাজার অঞ্চলে কয়েকটী চক * ও পটী তাঁহার নিজস্ব ছিল; ঐ সকল এবং অন্যান্য বাটী হইতেও তাঁহার প্রচুর উপার্জ্জন হইত।

* বর্ত্তমানে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত তারক পরামাণিকের চক উহাদের অন্যতম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপার্জ্জন ও দানশীলতা।

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, "সূর্য্য সহস্রগুণ উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করেন, তেমনই রাজা দিলীপ প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন।" অর্থের সদ্ব্যয় না হইলেই উহা সকল অনর্থের মূল হয়, কিন্তু উপযুক্তভাবে উহা ব্যয় করিতে পারিলে অর্থ অনন্ত সুফল প্রসব করে। ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত বিষয় পরকালে অনন্ত শান্তিলাভের সেতু স্বরূপ হয়। তারকনাথ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন লালসার বশীভূত হইয়া নহে, নানাভাবে পরার্থে তাঁহার বিভব ব্যয়িত হইত; নিষ্কামভাবে গোপনে দান করিলেই দানের অর্থসিদ্ধি হয়, নচেৎ দান করিয়া প্রকাশ করিলে সেই দান সার্থক হয় না। তারকনাথ দান করিতেন গোপনে, পাছে কেহ জানিয়া ফেলে, সেইজন্য তিনি স্বহস্তেই সকল দান করিতেন; দান করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, তাই প্রচুর দান করিয়াও তিনি প্রার্থীকে বলিতেন "যৎ কিঞ্চিৎ দিলাম, কিছু মনে করিবেন না।" বহু ছাত্র তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত; ঐ সকল ছাত্রের বেতন বাবদ প্রতি মাসে তাঁহার দেড়শত টাকা ব্যয়িত হইত। বহু প্রতিষ্ঠানে

তিনি নিয়মিত সাহায্য করিতেন। বেহালায় "আদি হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা" তাঁহার অর্থে, তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিতে স্থাপিত; বিপুল অর্থদান করিয়া তিনি উক্ত সভাটীর স্থায়িত্ব বিধান করিয়া যা'ন। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে তাঁহার বদান্যতার বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ঐ কিংবদন্তী সমূহে তিনি চির অমরত্ব লাভ করিয়া দেশবাসীর চিত্ত অধিকারপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সকরুণ লোকপ্রিয় অমায়িক ভাস্বর মূর্ত্তি উক্ত কিংবদন্তী-শ্রবণকারীর মানসে স্বতঃই প্রস্ফুট হইয়া উঠে। সেই মহাত্মার কৃপাপুষ্ট কোন প্রাচীন গদ্‌গদ ভাষায় যখন ঐ সকল পুরাতন গল্পের অবতারণা করেন, তখন সত্যই অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়। অক্ষম লেখনীর গুণে উপযুক্ত ভাষায় প্রাণবান্ করিতে না পারিলেও ঐ প্রবাদ সকলের, কয়েকটী এখানে উল্লেখ করিতেছি।

সুখচরের বাগান ও দরিদ্রবিদায়।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুখচর নামক স্থানে তাঁহার একটী বাগানবাটী ছিল। সুখচরে যাইবার পথে বেলঘরিয়ায় বিখ্যাত মতিলাল শীলের ঠাকুর বাটী। প্রতিবার বাগানে যাইবার সময় এই স্থানে তারকনাথের শকটের অশ্ব পরিবর্ত্তিত হইত; তাঁহার যাইবার দিন এই স্থানে পূর্ব্ব হইতেই পাঁচ শতাধিক নিরন্ন ভিক্ষুক অপেক্ষা করিয়া থাকিত। শকট উপস্থিত হইলেই ঐ সকল ভিক্ষুক শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন করিত।

অনন্তর, জনপ্রতি এক আনা করিয়া প্রদত্ত হইলে, উহারা নিঃশব্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত। তারকনাথের সহগামী কর্ম্মচারী এই বিতরণকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রতিবার বাগানে যাইবার সময়েই নিয়মিতভাবে এই কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইত। অনন্তর খড়দহে গুরুচরণ-বন্দন-পুরঃসর তারকনাথ প্রমোদোদ্যানে গমনপূর্ব্বক কর্ম্মভারক্লান্ত দেহকে সজীব করিবার নিমিত্ত কিছুকাল প্রিয়তম স্বজনগণের সহিত শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন। পরে যথাসময়ে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেন।

জলাশয়-খননে সাহায্য।

একবার কোন ব্যক্তি একটী পুষ্করিণী খননের অভিলাষ করেন। নিজের সঙ্গতি না থাকায় তাঁহার বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই; অবশেষে কয়েকজনের পরামর্শে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তিনি তারকনাথের নিকট উপস্থিত হ'ন এবং পুষ্করিণী খননের ব্যয়ের অনুরূপ আনুকূল্য মাত্র প্রার্থনা করেন। তারকনাথ সকল বিবরণ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে চতুর্দ্দিকস্থ লোকের প্রবল জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইলে, প্রার্থীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী জলাশয় খনন একান্তই প্রয়োজনীয়। উহাতে বহু লোকের প্রকৃতই উপকার হইবে; কিন্তু প্রার্থী যে পরিমাণ মুদ্রা ব্যয়-সঙ্কুলনের নিমিত্ত চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট নিতান্ত অল্প বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "মাত্র পুষ্করিণী খনন

করিলেই তো হইবে না, আরও অনেক খরচ আছে; সাধারণের জল লইবার সুবিধার জন্য একটী বাঁধান ঘাটের দরকার; তাহা ছাড়া পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদির ব্যয় আছে।" এই বলিয়া তিনি সমূহ ব্যয়ের একটা মোটামুটি হিসাব করিলেন এবং প্রার্থীকে সেই পরিমাণ মুদ্রা দান করিয়া বলিলেন, "এই সামান্য টাকার ভিতরই সকল কার্য্য কোনরূপে সমাধা করিয়া লইবেন, ঠিক খরচের মত দেওয়া হইল না, কিছু মনে করিবেন না।" আশার অতিরিক্ত লাভ করিয়া প্রার্থী বিস্মিত হইলেন, ততোধিক বিস্মিত হইলেন তারকনাথের বিনয়-নম্র ব্যবহারে। ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তারকনাথের কল্যাণকামনা করিতে করিতে প্রার্থী স্বস্থানে গমন করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার বহুদিনের মনের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইল। তারকনাথের ইচ্ছার অনুরূপ সকল কার্য্যই তিনি সমাধা করিলেন। পিপাসু পল্লীবাসি-সাধারণের একটী মহদুপকার সাধিত হইল।

বাল্য-বন্ধুর কন্যাদায় উদ্ধার।

তারকনাথের কোন সহপাঠী কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। দারিদ্র্যবশতঃ অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি অগতির গতি, তারকনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। তিনি বহুদিন পরে প্রিয়তম বাল্যবন্ধুকে দেখিতে পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইয়া উঠেন।

অচিরে বন্ধুর ভোজনের আয়োজন হইল; উভয়ে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক বিবিধ সুস্বাদু ভোজ্যের সদ্ব্যবহার করিলেন। অনন্তর তারকনাথ যথারীতি একটী মূল্যবান্ নূতন বস্ত্র উপহার দিয়া বন্ধুকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন ও একত্রে উপবেশন করিয়া নানারূপ অতীত প্রসঙ্গ আলোচনা পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অবসর ক্রমে বন্ধু আপনার পারিবারিক বৃত্তান্ত জানাইতে আহূত হইয়া আসন্ন কন্যাদায়বার্ত্তা বিবৃত করিলেন। তারকনাথ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "যাঁহার দায় তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এ বিষয়ে তোমার চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই—তুমি স্বচ্ছন্দচিত্তে অবস্থান কর।" অনন্তর, বন্ধু বিদায় লইবার সময় তারকনাথ, তাঁহার হস্তে খামে ভরিয়া কয়েকখণ্ড কাগজ গুঁজিয়া দিলেন। বন্ধু মনে করিলেন, উহা সামান্য সংখ্যক টাকার নোট হইবে, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে খুলিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! উহা যে পাঁচশত টাকার নোট! তারকনাথ ভুল করিয়াছেন মনে করিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও বন্ধুকে বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "উহা সামান্য টাকা মাত্র, তোমাকে দিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবে বন্ধুর প্রতি প্রীতিবশতঃ উহা গ্রহণ করিলে পরম আহ্লাদিত হইব, এই সামান্য টাকাতেই বিবাহকার্য্য কোনওরূপে সমাধা করিয়া লইও।" কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা

করিতে করিতে বন্ধু স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া, তিনি অভিলাষ সুসিদ্ধ করিলেন।

কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বস্ব দান।

একদিন সন্ধ্যাকালে তারকনাথ বড়বাজারের প্রধান গদীর কোন একখানি কক্ষে উপবেশন করিয়া, সেইদিনকার সমূহ আমদানী টাকা গণনা করিতেছিলেন। এমন সময়, এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ধৈর্য্য সহকারে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন সন্ধ্যাকাল, ব্যবসায়ী মহলে এই সময় কিছু দান করা নিয়মবিরুদ্ধ; তাই প্রথমতঃ তিনি একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু পরোপকার-প্রবণতা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণের আসন্ন বিপদবার্ত্তায় তিনি বিগলিত হইলেন। সহসা সম্মুখে স্তূপীকৃত মুদ্রারাশি হইতে এক মুষ্টি মুদ্রা উত্তোলন করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিলেন। হঠাৎ ব্রাহ্মণের অনবধানতা বশতঃ একটী মুদ্রা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া মুদ্রারাশির মধ্যে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া তারকনাথ বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর করিলেন কি? কোন মুদ্রাটী আপনার তাহা আমি কি করিয়া জানিব, শেষে কি আমাকে দত্তাপহারী হইতে হইবে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই সমূহ স্তূপীকৃত টাকাই তিনি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলেন। অতিমাত্র চমৎকৃত ব্রাহ্মণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে তদ্গতচিত্তে বিশ্বনিয়ন্তার

নিকট দাতার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিলেন; অনন্তর ত্র্যস্তপদে স্বগৃহে গমন করিয়া মহাসমারোহে কন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। এই ঘটনার পর হইতেই এইরূপ কন্যাদায় উদ্ধার তারকনাথের নিত্যব্রত হইল। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া নিজেরাই এরূপভাবে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন যে, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে দায়মুক্ত হইলেন নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেন না। একজন বহুজনমান্য প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে, এরূপ কত কন্যাদায়ই যে তারকনাথ ঠিক নিজ দায় মনে করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা।

Presidency Medical Dispensary নামক ঔষধালয়ে তারকনাথ দরিদ্র রোগিগণের ঔষধ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহার পত্র দেখাইতে পারিলেই রোগিগণ সেখানে বিনামূল্যে ঔষধ পাইত ও তাহাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইত। তিনি যথাসময়ে সমুদয় হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৎসরে দুই বার ধরিয়া ঔষধালয়ের সমূহপ্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দিতেন। একটী পৃথক্ দাতব্য চিকিৎসালয় না করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ কি? এই প্রশ্ন সহজেই সাধারণের মনে উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দাতব্যচিকিৎসালয় অপেক্ষা এই ব্যবস্থায় রোগিগণ সুচিকিৎসার মহত্তর সুযোগ পাইত; কারণ ঔষধালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ রোগি-সমাগম



৺আশুতোষ প্রামাণিক

লাভজনক জ্ঞান করিয়া, ইহাদিগের উত্তম চিকিৎসা ও উত্তম ঔষধ প্রাপ্তি এই উভয়েরই সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন— অবৈতনিক বা দাতব্য-চিকিৎসালয়ের মত এস্থানে ইহারা উপেক্ষিত হইত না। ইহা ছাড়া তাঁহার স্থাপিত কীর্ত্তি তদীয় বংশধরগণ রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা ?—ইহাতে তাঁহার ঘোর সংশয় ছিল। এই জন্য তিনি এই বিষয়ের একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়া যান নাই; কারণ জলবিম্বের ন্যায় সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, এই সার জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারাই তিনি পরিচালিত হইতেন।

গঙ্গাসাগরে সাধু প্রেরণ।

মকর সংক্রান্তির পূর্ব্বে কলিকাতায় গঙ্গাসাগরযাত্রী অসংখ্য সাধুর সমাগম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যোড়াসাঁকো পল্লীর লালাবাবুর বাজার * ও তন্নিকটবর্ত্তীস্থান সমূহেই ইঁহাদের প্রধান আড্ডা হইত। স্থানে স্থানে ধূনী প্রজ্জ্বলিত করিয়া ও তাঁবু খাটাইয়া ইঁহারা

* লালাবাবু বা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র—গঙ্গার পরপার গমনাভিলাষিণী ধীবর ললনাগণের মুখে "বেলা যায়" কথাটী শুনিয়া ইনি বিরাগী হ'ন ও মথুরায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। দুঃখের বিষয় ইহাঁর স্মৃতিপূত উক্ত বাজারটী এখন লুপ্ত। আকাশচুম্বি-প্রাসাদরাজি উহার স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে—চিৎপুর রোড ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ স্থলের পরপারে, উত্তর পশ্চিম কোণে উহা অবস্থিত ছিল। বারাকপুর ট্রাঙ্করোড ও পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থানে লালাবাবুর বংশধরগণ বাস করেন।

আপনাদের আশ্রয় করিয়া ল'ন ও কলিকাতার সহৃদয় ধনী-সাধারণের উপর নির্ভর করিয়াই, এখানে আপনাদের অস্থায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন ; ধনিগণের সহৃদয়তাতেই ইঁহাদের সাগরযাত্রার পাথেয় সংগৃহীত হয়। তারকনাথ প্রতিবৎসর এইরূপ বহু সাধুকে পোষণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে সাগরে পাঠাইবার নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার আনুকূল্যে কয়েকটী সাগরগামী বৃহৎ নৌকায় সাধুগণ গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে গমন করিতেন ও স্নানান্তর যথাকালে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া, আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ সাধুগণকে সাহায্য করা একটী মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ভস্মাচ্ছাদিত এই সকল মহাত্মার বাহ্যিক আড়ম্বরে আধুনিকগণ ভ্রূকুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীতে কাহার মধ্যে কোন্ শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহা কে বলিতে পারেন ? এই সকল সাধুর ভিতরই কত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ গোপনে, ছদ্মবেশে, অবস্থান করিতেছেন—যাঁহাদের ক্ষণিকের কৃপাদৃষ্টি মানবকে দুস্তর ভবপারাবার পার করিয়া দিতে সমর্থ। ভক্তিমান্ সজ্জনগণই সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের কৃপালাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে নানাবিধ লোকহিতকর কর্ম্মে তিনি বাৎসরিক দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। নানাস্থানে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়া তিনি তৃষ্ণার্ত্ত মানবগণের জলকষ্ট নিবারণ করিতেন। দান করিয়া তিনি কখনও ক্লান্ত হইতেন না ;

দান বিষয়ে তাঁহার স্থান, কাল ও পাত্রভেদ থাকিত না। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী, যে কোন স্থানে, বা যে কোন সময়ে, তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া বঞ্চিত হইত না। সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে সঙ্গোপনে প্রকৃত অভাবগ্রস্তকে দান করিয়া তিনি পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, এইরূপ দানই প্রকৃত নিষ্কাম দান আখ্যা পাইবার যোগ্য।

একবার এক পেশোয়ারী ফকির একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। তিনি একটী অদ্ভুত বাক্য উচ্চারণ করিয়া ধনিগণের দ্বারস্থ হইতেন। কাহারও কাহারও মতে উক্ত বচনটীর তাৎপর্য্য "কে এমন দাতা আছেন, যিনি আমার এই কলসীটী মোহর দিয়া ভরিয়া দিতে পারেন?" তারকনাথ

মসজিদ নির্ম্মাণে দান।

দ্বিপ্রহরে কোন কোন দিন আপনার বহির্ব্বাটীর একটী টেবিলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। সুযোগ বুঝিয়া সেই, সেই, দিন ফকির উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত বচনটী আবৃত্তি করিতেন। কয়েকদিন এই-রূপ বচন শুনিবার পর, একদিন তারকনাথ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইলেন, এবং মসজিদ নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় জ্ঞাত হইয়া সমূহ খরচ প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা অবলীলাক্রমে প্রদান করিলেন। ফকির সফলমনোরথ হইয়া আপনার ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত আশীর্ব্বচন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রফুল্ল মানসে মসজিদ নির্ম্মাণ ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তারকনাথের বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক কোন পূজাই বাদ যাইত না। গুরুচরণের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই বাটীতে বাঙালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। বাৎসরিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তারকনাথ মহা-সমারোহে এই পূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিতেন; পূজার ব্যয়ের সমূহ টাকা বড়বাজারের দোকান হইতে বস্তা বন্দী হইয়া গো-শকট যোগে বাটীতে আনীত হইত। এই সময় একবার উক্ত দোকানের কর্ম্মচারিগণ তারকনাথের পৌত্র-গণকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন "কা'দের পূজা, তোমাদের না আমাদের", পৌত্রগণ "আমাদের পূজা" বলিয়া উত্তর দিলে, কর্ম্মচারিগণ বলেন "তোমাদের পূজা তো, আমাদের দোকান থেকে টাকা যাচ্ছে কেন? ও তোমাদের পূজা নয়, আমাদের পূজা।" বলা বাহুল্য পৌত্রগণ ইহার কোন উল্লেখযোগ্য উত্তর দিতে পারেন নাই। এই পূজার সময় রন্ধনাদি কার্য্যের ইন্ধনের নিমিত্ত উল্টাডিঙ্গি হইতে প্রচুর কাষ্ঠ আমদানি হইত। মারহাট্টা খালে সমাগত প্রত্যেক নৌকা হইতে ক্রয় করিয়া, ঐ কাষ্ঠরাশি সঞ্চিত হইত—বাটীতে আনীত হইয়া পাঁজার আকারে স্তূপীকৃত করিয়া রন্ধনশালার সন্নিকটে উহা রক্ষিত হইত। দুর্গাপূজার প্রথম আমলে বহু

দুর্গাপূজা ও কাঙালী বিদায়।

বৎসরাবধি কাঙালী ভোজনের জন্যই দৈনিক বহু মণ ময়দা ভাজা হইত। কৃষ্ণা একাদশীর দিন হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় আরম্ভ হইত—ব্রাহ্মণগণকে, রসকরা, মিঠাই, গজা ও সন্দেশ প্রভৃতি পাঁচ ছয় প্রকারের মিষ্টান্ন এবং দধি ও ক্ষীর সহযোগে লুচি ভোজন করান হইত—তখন তরকারী ভক্ষণের রীতি ছিল না। ভূরি ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে চারি আনা হিসাবে দক্ষিণা প্রদান করা হইত। পূর্ব্বে কাঙালী-দিগকে লুচি, সন্দেশ, একসরা মুড়কী ও জনপ্রতি এক আনা হিসাবে বিদায় দেওয়া হইত। পরে নিম্নোক্ত বিধিতে কাঙালী ভোজন হইত।

প্রতিপদে তিন রকম বিদায়, কাঙালী একআনা, অপরিচিত ব্রাহ্মণ দুই আনা, পরিচিত ব্রাহ্মণ চারি আনা হিসাবে; অনন্তর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন কাঙালীদিগকে এক আনা হিসাবে বিদায় দেওয়া হইত। পূজার কয়দিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ছাড়া সাধুগণকেও ভোজন করান হইত। কাঙালী বিদায় কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য পূজার কয়দিন পুলিশের কয়েকজন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও পঞ্চাশজন প্রহরী তারকনাথের বাটীতে উপনীত হইতেন। তাঁহাদের ও তারকনাথের নিজ কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে প্রত্যহ বহু সহস্র কাঙালী বিদায় সম্পন্ন হইত। একবার এইরূপ কাঙালী বিদায়ের সময় একটী দুর্ঘটনা ঘটীয়া যায়। প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি সহসা ভূপতিত হইয়া কয়েকজন

কাঙালীকে জীবন্ত সমাহিত করে—তারকনাথ সংবাদ শুনিতে পাইয়া মর্ম্মভেদি-তারস্বরে গৃহদেবতা শ্রীধরকে—সকাতরে শ্রীধর—শ্রীধর—বলিয়া ডাকিতে থাকেন, যেন তাঁহার আন্তরিক আহ্বানে উদ্বুদ্ধ শ্রীধরই স্বয়ং অপর কয়েকজন কাঙালীর সাহায্যে দুর্ভাগ্যগণকে ইষ্টক সমাধি হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন দান করেন। একজন বৃদ্ধ বলেন তারকনাথের সেই শ্রীধর—শ্রীধর আহ্বান এরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, এখনও যেন তাহা শ্রবণ কুহরে নিনাদিত হইয়া অন্তরকে বিগলিত করিয়া ফেলিতেছে। ভক্তপ্রবরের ঐরূপ কাতর আহ্বানে কি বিশ্বরাজ নারায়ণ নীরব থাকিতে পারেন? কাঙালীগণ সহজে—স্বল্প চেষ্টাতেই, মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষিত হইল।

নিভৃতে অবস্থিতির কারণ নির্দ্দেশ।

তারকনাথ পূজার কয়দিন সকল সময়ই দ্বিতলে আপন কক্ষে একান্তে অবস্থান করিতেন—দৈনিক দুইবার মাত্র আরত্রিক দেখিবার জন্য পূজামণ্ডপে গমন করিতেন। সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত কয়দিন রাত্রিতে এক পেয়ালা চা মাত্র তাঁহার আহার্য্য ছিল। দশমীর দিন স্বজাতি-ভোজন সমাপ্ত হইবার পর, তিনি ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন; পূজার কয়দিন একান্তে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "এই সমারোহের সময় অনেকে অনেক রকম খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার চেষ্টা

করিবে, আমি সম্মুখে থাকিলে তাহাদের সঙ্কোচ হইতে পারে, তাই যাহাতে তাহারা অসঙ্কোচে তাহাদের ইচ্ছামত ভোজ্যাদি লইয়া যাইতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দিবার জন্যই আমি গোপনে অবস্থান করি—সকলের গৃহে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গ আছে, তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে সুতরাং উহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।”

এই সময় একদিন তাঁহার কর্ম্মচারী রাজনারায়ণ দাস একস্থানে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক লুক্কায়িত প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আবিষ্কার করেন এবং পরমানন্দে তাহা তারকনাথকে দেখাইবার জন্য আনয়ন করিলে, তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলেন “ব্রাহ্মণের দ্রব্য তুমি ছুঁইলে কেন? তাঁহার বাটীতে স্ত্রীপুত্র আছে, যাও, ঐ সব খাবার রান্নাঘর হইতে তাঁহাকে বেশী করিয়া দিবার ব্যবস্থা কর—ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ কাজ করিও না।” পূজার কয়দিন প্রত্যহ যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত কিংবা যে সকল মিষ্টান্ন, ক্ষীর, দধি আনীত হইত তাহা দৈনিক নিঃশেষরূপে ব্যয় করা হইত—একদিনের বস্তু অপরদিন রাখিবার রীতি ছিল না। প্রত্যেক দিন পাচক ব্রাহ্মণগণ প্রচুর লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া গৃহে গমন করিতেন, তারকনাথের আদেশে কর্ম্মচারিগণের কিছু বলিবার উপায় ছিল না—তাঁহারা সময়ে, সময়ে, অনুযোগ

পাচকগণের প্রতি ব্যবহার।

করিলে, অধিক পরিমাণ বস্তু অপহরণের সংবাদ পাইয়াও, তারকনাথ ধীরভাবে পূর্ব্বের মতই উহাদের স্ত্রীপুত্রের অজুহাত দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। একবার পূজার সময় রাত্রিকালে পাচকগণ সকলেই শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন, তখনও ভোজ্য প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয় নাই স্নুতরাং ভোজনকার্য্যে বাধা উপস্থিত হওয়ায় তারকনাথ সংবাদ পাইলেন; তখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গোলাপজল আনিবার আদেশ করিলেন এবং আনীত হইলে নিজেই তাহা সকল পাচকের মস্তকে ধীরে ধীরে সেচন করিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, ইহাতে সকল ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল ও তাঁহারা গৃহকর্ত্তাকে আপনাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই রাত্রির সঙ্কট অতিক্রান্ত হইল।

সকল ধর্ম্মে সমভাবাপন্ন তারকনাথ পূজার সময় স্বীয় বাটীতে আপন পল্লীস্থ সমূহ মুসলমান সহিস ও কোচম্যানগণকেও ভোজন করাইতেন। এই কার্য্য, যে বৎসর

সহিস ও কোচম্যানগণের ভোজন সমস্যা সমাধান।

প্রথম আরম্ভ হয়, সেই বৎসর, কেহ উহাদের উচ্ছিষ্ট পাতা গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায়, তারকনাথ স্বীয় অভ্যাগতগণকে দেবতা জ্ঞান করিয়া স্বয়ং তাহাদের উচ্ছিষ্ট লইতে প্রবৃত্ত হ'ন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অপর সকলে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে নিবারণ করতঃ আপনারাই উক্ত কার্য্য সমাধা করেন। তদবধি তাঁহার গৃহে

আর মুসলমানভ্রাতৃগণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে কেহ আপত্তি করে না।

শারদীয় মহোৎসব সুসম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তারকনাথের বাটীতে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে, মহালক্ষ্মী পূজার বিরাট অনুষ্ঠানের ধূম লাগিয়া যাইত—সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী এই মহাদেবীর অর্চ্চনা তিনি আপনার ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ আড়ম্বরের সহিত আপন দেবগৃহে নির্ব্বাহ করিতেন; চিরাচরিত প্রথানুযায়ী নারিকেলোদক সহিত চিপিটক অন্যান্য উপকরণাদির সহিত, উপযুক্ত পরিমাণে দেবী চরণে নিবেদিত হইয়া সাধারণ মধ্যে বিতরিত হইত। পূজার সময় কাঙালী বিদায় ব্যাপারের জন্য যে সকল ব্রাহ্মণাদি ভদ্রমহোদয় সমাগত হইতে পারিতেন না, এইদিন তারকনাথ তাঁহাদের ভোজনের মহদায়োজন করিতেন। এই ভোজন ব্যাপারে বিশ মণ ময়দার লুচি প্রস্তুত হইত ও ব্রাহ্মণগণকে চারি আনা হিসাবে দক্ষিণা প্রদত্ত হইত। আনুষঙ্গিক অন্যান্যদ্রব্য আহরণে গৃহকর্ত্তার কিছু মাত্র কার্পণ্য প্রকাশ পাইত না। নিমন্ত্রিত ও রবাহূতগণের বিশাল ভোজন ব্যাপারে অজ্ঞাতসারে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া সমাগত জনবৃন্দ কোজাগরী রাত্রির মাহাত্ম্য স্বভাবতই অনুভব করিতেন—রাত্রি জাগরণের কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইত না। এইরূপে ভক্তের আন্তরিক আরাধনায় মহাদেবী বর্দ্ধনশীল বিভব-রাশির মধ্য

কোজাগরী পূর্ণিমা ও অন্যান্য উৎসব।

দিয়াই আপনার মহতী প্রীতি প্রকাশ করিতেন। এই দুইটী পূজা ছাড়া তারকনাথ প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কালী, কার্ত্তিক ও সরস্বতী পূজা যথাযথ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। অন্যান্য পূজা ও রথযাত্রাদি নৈমিত্তিক উৎসব গৃহদেবতা ৺শ্রীধরের সমীপে অনুষ্ঠিত হইত। বৎসরের কোন পর্ব্বটীই বাদ যাইত না।

পর্ব্বদিনে ব্রাহ্মণগণের ফলাহার—পক্কান্ন ভোজন ব্যবস্থা পরিহার।

প্রতি একাদশী পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তির দিনে তারকনাথ ব্রাহ্মণগণকে চিপিটক, মুড়কী, দধি, কদলী প্রভৃতি ফল এবং বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন সহযোগে ফলাহার করাইতেন। ভোজনান্তে উপযুক্ত দক্ষিণা দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করিতেন। এক সময় ঐ কযদিন তিনি ব্রাহ্মণগণকে ফলাহারের বদলে লুচি খাওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, ঐ বিষয়ে প্রিয় বয়স্য শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের মত জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীধর বাবু বলেন "এখন তোমার অবস্থা ভাল, তাই, তোমার পক্ষে লুচি খাওয়ান কষ্টকর হইবে না কিন্তু তোমার বংশধরগণের এরূপ অবস্থা না থাকিতেও পারে সুতরাং তখন লুচি খাওয়ান তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে তাই, যেরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে উহাই থাকা আমার মতে ভাল।" তারকনাথ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "তাইতো হে তুমি যে মনে খটকা লাগিয়ে দিলে, আচ্ছা যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনই

থাক।” তদবধি যাবজ্জীবন তারকনাথ উক্ত ফলাহার ব্যবস্থাই যথাপূর্ব্ব বহাল রাখেন; বন্ধুবরের অকাট্য যুক্তি অনুসরণ করিয়া আপনার অভিলষিত পক্কান্ন ভোজনের প্রবর্ত্তন চিন্তা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধর-গণের স্কন্ধে যাহাতে কোন গুরুভার নিক্ষিপ্ত না হয়, যাহাতে তাঁহারা পিতামহ প্রবর্ত্তিত একটী অভিনব দুর্ব্বহ প্রথা লোপ-জনিত প্রত্যবায় ভাগী না হ'ন, তারকনাথ অঙ্কুরেই আপন ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করেন। জগৎ নশ্বর অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং কোন একটী মহৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া কেহ তাহা চিরদিন সমভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট অশোক আশা করিয়া ছিলেন, যতদিন সূর্য্য চন্দ্র থাকিবে, ততদিন, তাঁহার বংশধরগণ তাঁহারই মত দানশীল হইয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন (১)—কিন্তু মহাকাল-সমুদ্রের আবর্ত্তনে কয়েক পুরুষ পরেই তাঁহার পিতামহ-স্থাপিত বিশাল মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্রোতের মুখে তৃণগুচ্ছের মত, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হওয়াতে তাঁহার আশা মরুভূমিতে বারি বিন্দুর মতই শুষ্ক হইয়া যায়। জগতের ইতিহাস অনুশীলন করিয়া এইরূপ নানা ঘটনানিচয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তারকনাথ আপন অভিলাষ সংহরণ করিয়া যুক্তি-

(১) দিল্লী-সিবালিক পর্ব্বতস্থ সপ্তম স্তম্ভলিপি। অশোক অনুশাসন —৩৩ ও ৮৫ পৃষ্ঠা।

সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণও পৈত্রিক কীর্ত্তি লোপ জনিত দুর্ণামের ভাজন হ'ন নাই—অথবা দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে যাইয়া অযথা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বিষম বিপদে পতিত হ'ন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্র-মাহাত্ম্যপ্রচার ও ভাগবত-পাঠনায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়।

সনাতন শাস্ত্রনিচয়ে তারকনাথের সুদৃঢ়া শ্রদ্ধা ছিল—যাহাতে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সর্ব্বতোভাবে তদীয় পরিবারে প্রতিপালিত হয় এ বিষয়ে তাঁহার সুতীক্ষ্ণা দৃষ্টি ছিল। অশিক্ষিত সাধারণ যাহাতে সহজে, শাস্ত্রীয় উপাখ্যান সমূহে ব্যুৎপন্ন হয় এবিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। পুরাতন মহাভারতাদি-গ্রন্থ-নিহিত উপাখ্যান-রাজিতে প্রাচীন ভারতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত আছে। ঐ সকল উপাখ্যানের নায়ক নায়িকাগণ নিছক প্রাচীন ভারতীয় জীবনের আদর্শ। এই সব পুরাতন চরিত্রের সহিত পরিচয় থাকিলে, প্রকৃত ভারতবাসী কখনই আপনার জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। ভারতের যে বিস্মৃত যুগ চিরতরে যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত, সেই মহা যুগ প্রত্যক্ষ করিতে

হইলে অভিলাষিকে শাস্ত্রীয় কাহিনী-সকলের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইবে, তাই, আমাদের পিতৃপিতামহগণ যে পথে গমন করিয়া ধন্য হইয়াছেন সেই, স্বর্গীয় আলোকোজ্জ্বল পথে আধুনিক সনাতন সমাজেব গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, কিংবা সমাজের চিরাচরিত মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, চাই, সর্ব্বসাধারণকে শাস্ত্রীয় কাহিনীগুলির মর্ম্ম অবগত করান—এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাচীনযুগে এতদ্দেশে কথকতা ও ভারতাদি পাঠের নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল—বর্ত্তমানে এই প্রথা লুপ্ত হওয়ায় আমরা প্রকৃত ভারতীয় ভাব হইতে বহুদূরে পিছাইয়া পড়িয়াছি। তারকনাথ পূর্ব্বোক্ত সমাজ-নীতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদীয় ভবনে মহাসমারোহে ভাগবত পাঠের বিরাট আয়োজন করেন; এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাসভবনের পূর্ব্বাংশে একটী বিস্তৃত আটচালা নির্ম্মিত হয়—আটচালার দক্ষিণ-প্রান্তে মর্ম্মরগঠিত পাঠকের বেদী। এই বেদী হইতে কয়েক মাস যাবৎ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া পাঠক শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তারকনাথ সকল আত্মীয় ও স্বজাতীয়কে এই ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ নিমন্ত্রিত করেন। সুচারুরূপে সজ্জিত বর্ত্তিকালোক-সমুজ্জ্বল পাঠসভায় সমাগত সাধারণ শ্রোতাও পাঠকের বর্ণনা কৌশল ও গৃহকর্ত্তার ভক্তি-ভাবে বিমুগ্ধ হইতেন। এই কার্য্যে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। এখনও তাঁহার বাসভবনে যথাস্থানে পাঠকের বেদী বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে।

এইরূপ সমারোহ সহকারে ভাগবত পাঠ আর কোথাও হইয়াছিল কিনা জানিনা—বর্ত্তমান যুগের তো কথাই নাই—লোক শিক্ষার বাহক, ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ এই পাঠনাদিকার্য্য এই যুগে এক প্রকার লুপ্ত—তাই আমরাও ধীরে ধীরে নিজস্ব ভাবধারা হইতে বহুদূরে আনীত হইতেছি—আমাদের পরিণাম কি? মহাকালই তাহার উত্তর দিবে। মনুষ্যের ত্রিবিধ (১) ঋণের অন্যতম ঋষিঋণ; জ্ঞানার্জ্জন বা শাস্ত্র প্রচারের দ্বারা উক্ত ঋণ পরিশোধ হয়—তারকনাথ শৈশবে তাদৃশ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলেও উত্তরকালে শাস্ত্র-মর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া ঋষিঋণ হইতে অন্ততঃ আংশিক মুক্ত হইয়াছেন এ কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। কারণ বিদ্যাশিক্ষার তিনপ্রকার উপায়ের অন্যতম, প্রচুর ধন ব্যয় করিয়া শিক্ষা গ্রহণ। ভাগবত পাঠনায় তারকনাথ যে বিপুল ধনরাশি ব্যয় করেন উহাতে শ্রোতৃগণ যেরূপ, শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও তদ্রূপ, শিক্ষা লাভ করেন। পাঠকের মুখে ভাগবতের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া তিনিও উক্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া তিনি শাস্ত্রকার-নির্দ্দিষ্ট ঋষি-ঋণ হইতে নিঃসংশয়ে অংশতঃ মুক্তি-লাভও করিয়াছেন।

---

(১) ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং জ্ঞানকর্ম্মণা। সন্তত্যা পিতৃঋণঞ্চ পরিশোধ্য বনং ব্রজেৎ॥

যথাকালে তারকনাথের বিবাহ হয়; তাঁহার শ্বশুরের নাম-ধামাদি বর্ত্তমানে জানিবার উপায় নাই—উক্ত বিবাহের ফলে তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে; কালীকৃষ্ণের প্রথম ও মধ্যম পুত্রদ্বয়ের বিবাহ তারকনাথের কীর্ত্তি সমূহের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে কংসকার জাতির বিবাহপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। এই জাতির বিবাহ এক বিরাট ব্যাপার। বিবাহের আটদিন স্বজাতীয় সকল গৃহস্থকে ভোজদান এই জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাঁহারা একহাঁড়ি ভাত রাঁধিয়াও সকলের আবাহন করিতে বাধ্য। স্বগোত্রে ইঁহাদের বিবাহ হয় না। সায়সন্দেশ, পানপাত্র, মুনিভাঙ্গা, বরনায়ান, আটমঙ্গলা, ঘরবসত প্রভৃতি ইঁহাদের বিবাহের অঙ্গ। তারকনাথ প্রিয়তম পৌত্রগণের বিবাহ যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহের সমারোহ অপেক্ষা পৌত্রগণের পরিণয় উৎসবের সমারোহ অধিকতর আকর্ষণের ব্যাপার হইয়াছিল। এই আনন্দোৎ-সবে তারকনাথ স্বকীয় প্রগাঢ়-স্বধর্ম্ম-প্রীতির পরিচয় প্রদান করেন। আসন্ন উৎসবের আনন্দলিপ্সু আত্মীয়গণ আপনাদের অন্তরের একটী অভিলাষ পূরণের জন্য স্বর্গীয় ডাক্তার কৈলাস চন্দ্র বসুকে আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ তারকনাথের নিকটে

কংসকার জাতির বিবাহ পদ্ধতি ও পৌত্র দ্বয়ের বিবাহ।

প্রেরণ করেন। কৈলাস বাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আপনার পৌত্রদ্বয়ের বিবাহ, পরম আনন্দের ব্যাপার, সকলের ইচ্ছা যে, আপনি, এই উপলক্ষ্যে সাহেবদের ভোজ ও নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।" তারকনাথ বলিলেন, "ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে তোমরা ভাবিয়া দেখিও, যাহা করিতে বলিলে তাহা ভাল, না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আবাহন পূর্ব্বক তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ ও ভোজনান্তে উপযুক্তভাবে বিদায় দান ভাল। যাহা স্থির হয় আমাকে তাহা জানাইলে আমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।" এই কথার উপর আর কেহ কোন কথা বলিতে না পারায়—বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন হয়।

রাজা উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি-প্রশংসা পত্র।

তারকনাথের দানশীলতার কথা যথাকালে রাজপুরুষ-দিগের কর্ণগোচর হয়, তাঁহারা তাঁহাকে রাজা উপাধি দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ রূপে ভারত-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে কলিকাতায় উপনীত হ'ন। বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজাদের বিখ্যাত বাগানে তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি সেখানে তারকনাথের গুণগ্রাম অবগত হইয়া রাজপুরুষগণের পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে তাঁহার নিকট দূতরূপে প্রেরণ



৺মন্মথনাথ প্রামাণিক

করেন। তিনি তারকনাথের ভবনে উপস্থিত হইলেন; তারকনাথ তখন প্রতিদিনকার প্রথা মত একটা প্রকাণ্ড বাটীতে গোমূত্র লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে ছিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে খুড়ো বলিয়া আহ্বান করিতেন—সেকালে এইরূপ সম্বন্ধস্থাপন সর্ব্বজাতির সামাজিক রীতি ছিল। এক-পল্লীবাসি-বিভিন্নজাতীয়-ব্যক্তিগণ পরস্পরকে সমপরিবার ভুক্ত ও অভিন্ন মনে করিয়াই মর্য্যাদার অনুরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বর্ত্তমানে এই প্রথা সহরে না থাকিলেও পল্লীগ্রাম হইতে এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পল্লী বহু দোষের আকর হইলেও এখনও একগ্রামবাসি-সকলে পরস্পর আত্মীয়তা-বোধক অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ-পাতান প্রথাটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজে পরস্পর আত্মীয়তা-স্থাপন-সূচক এই রীতিটী যে অতি মধুর ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজ পাশ্চাত্ত্যভাব-প্লাবনে আমাদের নিজস্ব এই সকল উত্তম নিয়ম-পদ্ধতি আমরা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছি—কৃষ্ণদাস তারকনাথের সন্নিধানে উপনীত হইয়া বলিলেন "খুড়ো! রাজা একবার আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন"। তারকনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি? আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে রাজা দেখিতে চা'ন!" কৃষ্ণদাস বলিলেন "কেবল দেখিতে নহে, তিনি আপনাকে রাজা উপাধি দিতে ইচ্ছুক"। অতিমাত্রবিস্মিত তারকনাথ মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত কহিতে লাগিলেন

রাজা উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি

"বাবাজি! ভাইপো থাকিতে কি আমার রাজা হওয়া সাজে? তুমি রাজা হওগে যাও, আমার তা'তেই আনন্দ, আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, রাজা হওয়া ভাল, না, রাজার খুড়ো হওয়া ভাল? আমার মনে হয়, রাজার খুড়ো হওয়া আরও বেশী গৌরবের; তুমি রাজা হও, তাহ'লেই আমার গৌরব হবে।" বিস্ময় বিমূঢ় কৃষ্ণদাস ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—তিনি সংসারিরূপী সন্ন্যাসীটির মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে ধীর-পদে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণদাসের দৌত্য নিষ্ফল হইলেও রাজপুরুষ-গণের ঔৎসুক্য প্রশমিত হইল না। তাঁহারা যে কোন উপায়ে তারকনাথকে সম্মানিত করিয়া উপযুক্ত গুণীর আদর করিতে যত্নবান্ হইলেন। অনন্তর রাজপ্রতিনিধির ইচ্ছামত বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁহাকে একটী উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রেরণ করিয়া আপনাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। উক্ত প্রশংসাপত্রে তারকনাথের সদ্‌গুণ সমূহ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে প্রশংসা পত্রটীর বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। "পরম সম্মাননীয় রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তা মহোদয়ের আদেশানুসারে পরম দয়াবতী মহামান্যা ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামে বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের উল্লেখ যোগ্য চরিত্র দানশীলতা ও উদারতা উপলব্ধি-

প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক

পূর্ব্বক তাঁহাকে এই প্রশংসাপত্রখানি উপহার প্রদত্ত হইল।" (১)

১লা জানুয়ারী

১৮৭৭

(স্বাঃ) রীচার্ড টেম্পল

এই প্রশংসা পত্রখানি তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর একটী দরবার-আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বহস্তে তারকনাথকে প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তারকনাথের বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা উল্লিখিত ছিল; উপসংহারে তিনি বলেন তারকনাথের ন্যায় দাতা আর কেহ কোথাও আছেন কিনা তাঁহার জানা নাই—তারকনাথ এবংবিধ প্রশংসা-সূচক বাক্যে যে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করেন তাহা বলাই বাহুল্য।

রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক স্বহস্তে প্রশংসাপত্র দান।

(১) By command of His Excellency the Viceroy and Governor General, the certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty Victoria Empress of India to Babu Tarak nath Pramanik in recognition of his noted character, charity and liberality. January 1st. 1877 (Sd) Richard Temple

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তারকনাথের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত মধুর। অতুল বিভবশালী হইলেও অহঙ্কার কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

অহঙ্কার-শূন্যতা।

তাই যখন বিদেশে মাল রপ্তানী কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, তখন মাল ওজনের জন্য আট দশ খানি কাঁটা ব্যবহৃত হইত; কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত থাকিলেও সময়ে সময়ে তিনি স্বয়ং স্বহস্তে উক্ত কাঁটাগুলিতে মাল উঠাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। অসৎ কর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল কিন্তু ন্যায়সঙ্গত যে কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিতে তাঁহার আপত্তি থাকিত না, কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চনীচ-ভেদরক্ষা তাঁহার মতে অবৈধ ছিল—প্রয়োজন হইলে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ না করিয়াও তিনি সামান্য শ্রমজীবির কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রকৃত-উন্নতিশীল-মহাপুরুষগণ এই নীতি অনুসরণ করিয়াই জগতে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই আমেরিকার সংযুক্ত-রাজ্যের প্রসিদ্ধ নেতা জর্জ্জ ওয়াসিংটন সামান্য সৈনিক পুরুষের সহিত শ্রমজীবির কার্য্যে প্রফুল্লচিত্তে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লান-বদনে মোট বহন করিয়া ছিলেন। আধুনিক যুবকগণের যাঁহারা আপনাদের সামান্য পুটুলীটীও লইয়া রাজপথ দিয়া

পদব্রজে যাইতে প্রবল সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহারা এই সকল মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া মিথ্যা সঙ্কোচ পরিহার করুন। বিধি ও নীতি-সঙ্গত কোন কার্য্যই মর্য্যাদা-হানিকর নহে—উন্নতি করিয়া মহাজন-পদবাচ্য হইতে হইলে, কোন কর্ম্মকেই অবজ্ঞা করিলে চলিবে না, প্রয়োজন মত সকল কর্ম্ম করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। জীবনে কখন কি অবস্থা আসিবে, যখন তাহার কোনই স্থিরতা নাই, তখন সকল অবস্থা প্রফুল্লচিত্তে যাপন করিবার জন্য সকলপ্রকার কর্ম্মেই অভ্যস্ত থাকা উচিত। তাহা হইলে, কোন অবস্থাতেই আর ক্লেশ বোধ হইবে না, পরন্তু সকল অবস্থাই সুখকর হইবে।

তারকনাথ অতিশয় বলশালী লোক ছিলেন; কোন পরিশ্রমের কার্য্যকেই তিনি ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। ব্যবসায় যখন দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে বিচরণ করিতেছিল, তখন তিনি অক্লান্তভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। পরিশ্রম করিতে হইলে দৈহিক সুস্থতা ও উত্তম আহার্য্য প্রয়োজন; তারকনাথ আহার-বিহারে দৃঢ় সংযমী হইয়া আমরণ স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন। সাত্ত্বিক আহার তাঁহার প্রিয় ছিল। মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে তিনি মৎস্যাদি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্ন খাইতে আরম্ভ করেন। ঐ যুগে বঙ্গদেশে নানাপ্রকার অখাদ্য

উত্তম স্বাস্থ্য ও মিতাচার।

ভোজন করিয়া নব্যযুবকগণ আপনাদিগকে কুসংস্কারমুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সুরাপান ও নিষিদ্ধবস্তুভোজন একপ্রকার সামাজিক-রীতি হইয়া উঠিয়াছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতার যুগেও তারকনাথের স্বাভাবিক সংযম-প্রবণতা বস্তুতই প্রশংসনীয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাত্ত্বিক ভোজী হইলেও শারীরিক পুষ্টি-বিধান বিষয়ে তিনি স্পৃহা-হীন ছিলেন না। কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী সবল দেহ গঠন করিতে হইলে যে সকল পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তিনি তাহা গ্রহণ বিষয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন না। রসনার তৃপ্তি বিধানের জন্য নহে, কিন্তু কায়িক বলাধানের জন্য তিনি গব্যঘৃত, উপযুক্ত পরিমাণে দৈনিক ভোজন করিতেন। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতির সরবৎ তাঁহার নিয়মিত পানীয় মধ্যে গণ্য ছিল, ঐসকল দ্রব্য ভোজন করিয়া পরিপাক করিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ রকমেরই ছিল। ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপ জীর্ণ হইলে, পুনরায় আহার করা ভৈষজ্য-বিজ্ঞান-সম্মত বিধি। এই বিধি তিনি যথাযথ পালন করিতেন। যাঁহারা উত্তম ভোক্তা, ভোজন করান, তাঁহাদের স্বভাবতই প্রীতিকর কার্য্য। তারকনাথ স্বয়ং যেরূপ উত্তম বস্তু ভোজন করিতেন অপরকেও, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে, তাহা ভোজন করাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। মানুষ

ভোজনের জন্য জীবনধারণ করেনা কিন্তু জীবনধারণের জন্যই নিয়মিত বলকর খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়, এই নীতি তারকনাথ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন, এই নিমিত্ত, তাঁহার দেহে ব্যাধির প্রকোপ খুব কমই ছিল—পরন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ অক্ষুন্নভাবে পালন করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকায় তিনি আজীবন উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী থাকিয়া অতি সুখকর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি সাধারণ ধনি-ব্যক্তিদের সম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। প্রায়ই দেখা যায় যে, যাঁহারা অতুল বিভবশালী তাঁহাদের দেহ অপরিমিত আচরণ হেতু নানা রোগের আকর। এক্ষেত্রে ধন তাঁহাদের প্রকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হইতে পারে না। এই জন্য তাঁহাদের অনেকের মুখ হইতে নিম্নোক্ত আক্ষেপোক্তিটী সর্ব্বদাই শ্রুত হয় যে, "স্বাস্থ্যই প্রকৃত ধন—স্বাস্থ্যহীন ধনবত্তা সুখদায়ক নহে"—প্রসিদ্ধ ধনী মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় অতি হীন স্বাস্থ্যের জন্য চিরজীবন প্রবল অশান্তিতে যাপন করিয়াছেন। অপরিমিত মহোত্তম ভোজ্যদ্রব্য সকল সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিলনা সুতরাং মহাধনী হইয়াও তাঁহাকে ভোজন বিষয়ে চিরদরিদ্রের জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থা যে অতি শোচনীয় সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই—তারকনাথ এবিষয়ে মহাপুণ্যবান্, তিনি একাধারে অতুল বিভবশালী,

উত্তম স্বাস্থ্যবান্ ও মিতাচারী। ইহা মনুষ্যজীবনের একটী সুন্দর আদর্শ ও প্রত্যেক উন্নতি-কামী ব্যক্তির অনুকরণ যোগ্য। এইরূপ জীবনই প্রকৃত সুখের জীবন! অন্যথা জল মধ্যে বিচরণশীলের তৃষ্ণার ন্যায় পরিমিত ভোগেও অসমর্থ ধনি-জীবন যেন একটা বিরাট অভিশাপের বাহক বলিয়া মনে হয়।

শাস্ত্রে আছে যথাকালে একটী আহুতিও ভাল অকালে লক্ষ কোটী আহুতিও ভাল নহে। (১) ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সুযোগ ও সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তারকনাথ উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া এরূপভাবে ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ করিতেন যে, তাহাতে তিনি প্রচুর লাভবান্ হইতেন। কলিকাতার বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী পারসিক-রাজদূত মাণিকজী রুস্তমজী তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন; এই ব্যবসায়ি-পরিবারের সহিত তারকনাথের এরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল যে ইঁহাদিগকে একপরিবারভুক্ত বলিয়াই মনে হইত। পরস্পরের গৃহকর্ম্ম ও উৎসবাদিতে পরস্পর তত্ত্বাবধান করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। এইরূপ তৎকাল-প্রসিদ্ধ অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ির সহিত তারকনাথের প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহারা পরস্পরের সহায়ক ছিলেন—উপযুক্ত সুযোগে যাহাতে সকলেই আপনাপন ব্যবসায়ে লাভবান্ হ'ন এবিষয়ে

বিদেশীয় ব্যবসায়ি-বন্ধু ও সুযোগের সদ্ব্যবহার।

(১) বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।

সকলের দৃষ্টি ছিল—আধুনিক বহু ব্যবসায়ির মত ইঁহারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করিয়া কিসে কাহার অনিষ্ট হয় তাহা না করিয়া, বরং যিনি যে বস্তুর ব্যবসায় করেন, সুযোগ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে সকলে সমবেত চেষ্টায় সেই বস্তুর ক্রয় বিক্রয়ে প্রচুর লাভ করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইত এবং একের ব্যবসায় অন্যে করায়ত্ত করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইবার নীতিও ছিল না। বর্ত্তমান কলিকাতাবাসি-ব্যবসায়িগণ উপরোক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালন না করায়, তাঁহাদের মধ্যে তীব্র অশান্তির বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে দেখা যায়, কালে তাহাদ্বারা মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। পশ্চিম দেশীয় বণিক-সম্প্রদায় বাঙালী বিদ্বেষ-দোষ-দুষ্ট এবং বাঙালী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ধ্বংস করিতে তৎপর, ইহার ফলেই "বাঙালীর জন্যই বাঙালাদেশ" এই আন্দোলনের মৃদু গুঞ্জন শ্রুত হইতেছে এবং উহাই সময়ে প্রবলতর হইতে থাকিবে এ বিষয়ে সংশয় নাই, তাই, অতীত যুগের পূর্ব্বকথিত নিয়মসকল আয়ত্ত করিয়া, কলিকাতার প্রবাসি-ব্যবসায়িকুলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যে দেশের অন্নে তাঁহারা পরিপুষ্ট, সেই দেশবাসির, অনিষ্ট-সাধন-বিষয়ে সামান্য চিন্তাও ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত পাপবিশেষ অতএব অতীতের সেই সুখকর নীতি সকল তাঁহাদের অবলম্বনীয় হউক। তবেই

তাঁহারা শাস্তির অধিকারী হইবেন। পূর্ব্বোক্ত রুস্তমজী স্বয়ং বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু কোন সুযোগে পিত্তল ও তাম্রের চাদরের ব্যবসায় একচেটিয়া করিবার সুযোগ করিয়া দিয়া, তিনি তারকনাথকে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তিবিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। তারকনাথও বন্ধুর যুক্তি গ্রহণ করিয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করতঃ বিপুল বিত্তলাভের অধিকারী হইয়াছিলেন—তারকনাথের ডক ব্যবসায়ের বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; একদা তিনি তদীয় বন্ধু রুস্তমজীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, বহু জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিতেছে, ঐ সকল জাহাজ মেরামতের জন্য অনেক পিত্তল ও তাম্র চাদরের প্রয়োজন। দূরদর্শী তারকনাথ বন্ধুর উপদেশমত কলিকাতার সমূহ চাদর ক্রয় করিয়া স্বীয় গুদাম জাত করিলেন। যথাসময়ে জাহাজগুলি কলিকাতাবন্দরে উপস্থিত হইলে, চাদরের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, কিন্তু অন্য কোথাও চাদর না থাকায় তারকনাথের গুদাম-সঞ্চিত চাদরগুলি অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইল। তারকনাথ একদিনেই তিন লক্ষ মুদ্রা লাভ করিলেন—এইরূপে উপযুক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার মহৎফল প্রসব করিল। আরও একবার তিনি বহু লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ডক্ ব্যবসায়ের সুনাম উক্ত অর্থ লাভের কারণ—সেবার ডকের অংশ সমূহ অতি উচ্চ মূলে বিক্রীত হইতে লাগিল, কারণ ডক কর্ত্তৃপক্ষের বিপুল লাভের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সাধারণ

সহজেই ঐ ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও উহার অংশ ক্রয় করিলে স্থায়ি-ভাবে প্রচুর আয় হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, চল্‌তি বাজার দর অপেক্ষা বহুগুণ অধিক মূল্য দিয়া অনেক অংশ ক্রয় করে—এইরূপে সেইবারও একদিনে তারকনাথ কয়েক লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাশিক্ষার তাদৃশ সুযোগ না পাইলেও তারকনাথ বিদ্বানের বন্ধু ও স্বয়ং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; তাঁহার বিদ্যার্থি-পোষনের বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। শ্রীধর মুখোপাধ্যায় নামক একজন ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ তাঁহার বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন, তারকনাথ তাঁহার নিকট চলন সই ইংরাজী শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। উহার সাহায্যেই তিনি সাহেবদিগের সহিত কাজ চালান গোছের কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। ভূয়োদর্শন ও বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার এরূপ শক্তি জন্মিয়াছিল যে, বলিবামাত্রই তিনি ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষায় কথিত বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। লোক চরিত্রে

অভিজ্ঞতা ও অনাড়ম্বর জীবন।

তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, দেখিবামাত্রই কে কিরূপ লোক তাহা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। এই কারণে একদিকে যেমন কোন কপটাচারী তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে পারিতনা, অন্যদিকে তেমনই প্রকৃত সৎপাত্র তাঁহার সহায়তা ও শ্রদ্ধা লাভে বঞ্চিত হইত না। এবিষয়ে আমরা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বেশভূষা কিংবা বিলাসিতার প্রতি তাঁহার দারুণ বিরক্তি ছিল; অধিকাংশ সময়ে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত পরিহিত একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করিয়াই তিনি কাল যাপন করিতেন। কর্ম্মস্থলে গমনের সময়, মাত্র, চলনসই ভদ্রোচিত পোষাক পরিধান করিতেন উহাতে আড়ম্বরের লেশমাত্রও থাকিত না, প্রয়োজনের খাতিরে তিনি উক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। স্বীয় বাস-ভবনেরও আড়ম্বরপূর্ণ সজ্জা তাঁহার অনভিমত ছিল। কোন উৎসবাদির সময় তাঁহার আত্মীয়গণ আবাস-গৃহের কক্ষ-গুলিকে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিলে, তিনি তাহা অনুমোদন করিতেন না, তাঁহার মতে কক্ষসমূহের সরল সজ্জাই শোভনীয় ও তৃপ্তিদায়ক ছিল। উচ্চ শ্রেণীর সৌন্দর্য্য-রসিকগণ কারু-বাহুল্য ও চিত্র-প্রচুর-শিল্পকার্য্য-মণ্ডিত গৃহ-সজ্জার বিরোধী। যে মৌর্য্যরাজগণ ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসেও যাঁহাদের সমকক্ষ অধীশ্বর, অতিবিরল, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিল্পকার্য্যের পোষক ছিলেন না। সম্রাট অশোকের যে সকল স্তম্ভ বা বৃতি

আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের কোনটীতেই কারু বাহুল্য নাই—উহাদের প্রত্যেকটীর গাত্র এরূপ সুমার্জ্জিত যে, দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইলেও উহারা অদ্যাবধি মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ। অনেক মনস্বী ব্যক্তির অভিমতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর শিল্প। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য কারুকার্য্য আছে তাহাও সুরুচি-সম্মত। জাপানের অধিবাসিদের গৃহ-সজ্জাও অনাড়ম্বর ও সুন্দর। এই সকল বিচার করিলে দেখা যায় উচ্চ শ্রেণীর রসজ্ঞগণ সকল বিষয়েই সারল্যের পক্ষপাতী। সরল জীবন-যাত্রা প্রণালী ও উচ্চ চিন্তায় আত্মনিয়োগ ভারতীয় মনস্বিকুলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যবিধাতা অদ্বিতীয় কূটনীতিজ্ঞ চাণক্য একটী বিশাল রাজ্যের কর্ণধার হইয়াও স্বয়ং গোময়-পরিলিপ্ত পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন। ভারতের শেষ সর্ব্বজনমান্য সম্রাট শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য নিঃশেষে বিতরণ করিয়া বল্কল বা জীর্ণ বস্ত্র-মাত্র পরিধান করিয়া শান্তি লাভ করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও অনাড়ম্বর সহজ জীবন-যাত্রা প্রণালী তারকনাথের স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। তাই সাধারণ ধনিবৃন্দের ন্যায় ধনবত্তাসূচক সাজসজ্জা-বহুল, সুরঞ্জিত ও চিত্র-পরিশোভিত কক্ষরাজি তাঁহার প্রীতিকর ছিল না—তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তদীয় অট্টালিকার প্রত্যেকটী কক্ষ, মাত্র শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করা হইত ও ঐ সকলের ভিতর কোন প্রকার আসবাবের বাহুল্য

থাকিতে পাইত না। কক্ষসমূহে সদ্ভাব-বর্দ্ধক দেব দেবীগণের সুদৃশ্য চিত্রপট সকল দেওয়ালে লম্বমান থাকিত—চক্ষুর তৃপ্তিকর স্বদেশীয় প্রথানুমোদিত আলোকমালা গৃহ-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত। গৃহের যাহাকিছু সজ্জা সকলই মানসিক প্রশান্তির পরিপোষক ছিল।

বসত বাটীর বিবরণ।

এস্থলে তারক নাথের বসত বাটীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দান, আশাকরি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার প্রাসাদোপম বিশাল বাসভবনটীর বর্ত্তমান পরিণতি বহু বৎসর ও বহু পুরুষের চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তারক প্রামাণিক রোড নামক রাজপথটীর প্রায় পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত এই ভবনটী উত্তর দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব্ব পশ্চিমেই সমধিক বিস্তৃত। প্রাচীন বাস্তু বিজ্ঞানানুযায়ী ইহা নিখুঁত ভাবে নির্ম্মিত না হইলেও, ইহা পুরাতন বঙ্গীয় ধারায় বিনির্ম্মিত। বাসভবনটী সাত মহল ও স্থানে স্থানে চকমিলান—পশ্চিম দিকের কতকাংশ ত্রিতল, এই মহলের পূর্ব্বাংশে চণ্ডীমণ্ডপ অবস্থিত; এই মহলটী মদনমোহন নির্ম্মাণ করেন। ইহার পশ্চাতে আটচালা—সমগ্র বাটীর উত্তরাংশের প্রথম ও দ্বিতীয় তল বহির্ব্বাটী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাংশের দ্বিতলে অন্দর ও নিম্নতলে রন্ধন-শালা। বাটীর পূর্ব্বাংশ গুরুচরণ নির্ম্মাণ করেণ। সর্ব্ব পশ্চিমাংশে অন্দর ও শকট শালা। দ্বিতলের অনেক অংশ তারক নাথের মির্ম্মিত। তাঁহার বংশধরগণের প্রচেষ্টায় উহা

আধুনিক রুচিসম্মত ও সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত হইলেও গৃহ সজ্জার বংশগত প্রাচীন ভাব পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি কক্ষ পবিত্রতা-দ্যোতক দেবদেবীগণের চিত্র-শোভিত—সাজসজ্জা অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর। বিভিন্ন যুগের প্রথামত গৃহখানি কখনও ঝাড় ও গোলক লণ্ঠন দ্বারা, কখনও বা গ্যাসালোক দ্বারা আলোকিত হইয়া আসিয়াছে—বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক বর্ত্তিকা ও ব্যজনী দ্বারা কক্ষ সমুহ সুশোভিত হইলেও প্রাচীন যুগের গোল-লণ্ঠন এখনও সন্ধ্যাদীপরূপে বহু কক্ষেই ব্যবহৃত হইতেছে। কেরোসিন-তৈল-জ্বালিত-আলোকাধারসমূহও স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হওয়ায় বৈদ্যুতিক-বর্ত্তিকা সহসা নির্ব্বাপিত হইলেও গৃহবাসিগণের কোন অসুবিধা হয় না। টেলিফোন ও রেডিওফোন যন্ত্রও বর্ত্তমানে গৃহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। জল সরবরাহের উপায়-স্বরূপ কূপ, নলকূপ, অপরিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত জলের কল গৃহে থাকায়—কলের জল না থাকিলেও কাহারও অসুবিধা হয় না। এককথায় গৃহটীতে নব্য রুচির সহিত প্রাচীন রুচি একাধারে স্থান লাভ করিয়াছে। গৃহবাসিগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণাদি অভ্যাগতের প্রতি যেরূপ ভক্তিমান্, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণও তাঁহাদের তেমনই পূজনীয়, তাই পিতৃ-পিতামহের ও অপরাপর বংশধরগণের চিত্ররাজি গৃহের শুধু শোভা-বর্দ্ধকরূপে নহে পরন্তু বর্ত্তমান গৃহবাসিগণের ভক্তি ও স্নেহাদি আন্তরিক বৃত্তির অবলম্বনরূপে স্থানে স্থানে লম্বিত রহিয়াছে! কলিকাতার

বসত বাটীর বিবরণ

প্রাচীন প্রাসাদোপম-বাসভবনগুলি সাধারণতঃ যে কায়দায় নির্ম্মিত এই ভবনটিও প্রায় সেই কায়দায় নির্ম্মিত, তবে অন্যান্য চকমিলান বাটির চতুর্দ্দিকস্থ বারান্দায়, যেরূপ যুগ্ম-স্তম্ভরাজি দৃষ্টিগোচর হয় এই বাটীতে তাহা অপ্রতুল। ইহার আর একটি বিশেষত্ব পূর্ব্বদিকস্থ চণ্ডীমণ্ডপ—কলিকাতার প্রাচীন বাটীগুলির অনেকের চণ্ডীমণ্ডপ উত্তরাংশে অবস্থিত; হাট-খোলার দত্তবাটী, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবাটী, শোভাবাজার রাজবাটী, মতিলাল শীল ও দেবেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি কলিকাতার অধিকাংশ প্রাচীন বাটীর চণ্ডিমণ্ডপ উত্তরাংশে নির্ম্মিত। প্রসিদ্ধ গোকুল মিত্র, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন, বড় বাজারের গাঙ্গুলী প্রভৃতি কয়েকটী বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ এইরূপ পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান। বাটীর বহিরাবরণ ব্যতীত, ইহার অভ্যন্তরে আধুনিক বংশধর গণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত যে শ্রদ্ধামণ্ডিত-সনাতন-ধারা প্রবহমান, এবং যাহাতে অবগাহন করিয়া তাপিত-তৃষিতমাত্রই পরা শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার প্রবর্ত্তক পিতৃ-পিতামহ পুণ্যজাত মহাত্মা তারকনাথ, ইহাই এস্থলে পরম উল্লেখ যোগ্য বিষয়;—এই ভাববর্জ্জিত রাজপ্রাসাদও শ্মশানতুল্য, আর এই ভাবোচ্ছ্বাসিত পর্ণশালা-ও স্বর্গ।



শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ প্রামাণিক

দশম পরিচ্ছেদ

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আপনার পল্লীর বহু বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব-ভার, তারকনাথকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে কালে,—কলিকাতার জেলে পাড়ার সংযাত্রা-উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে,—প্রতি চৈত্র-সংক্রান্তির দিন কাঁসারী পাড়ার প্রসিদ্ধ সংযাত্রা বাহির হইত; এই সংযাত্রা-সমবায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন তারকনাথ ও কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়। সংযাত্রা দেখিবার নিমিত্ত সাধারণের এরূপ আগ্রহ ছিল যে, সং বাহির হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজ-পথের সম্মুখস্থ বারান্দাগুলি, দর্শনার্থি-জনসংঘকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া যাইত; ঐ সকল ভাড়া দিয়া গৃহের মালিকগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন। জনসমুদ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিত। এই বিশাল-জনতা অতিক্রমপূর্ব্বক, যান-বাহনের চলাচল এক-প্রকার অসম্ভব হইত—সময়ে দুর্ঘটনাও যে না ঘটিত তাহা নহে, একবার তারকনাথেরই বাটীর প্রবেশদ্বারের পার্শ্বস্থিত-আলোকস্তম্ভ জনতার চাপে, পড়িয়া যায়; যাহাহউক পুণ্যাত্মার প্রভাবে কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। সংযাত্রার সাজ-সজ্জা ও বিষয়বস্তু সাধারণের অতি আকর্ষণের জিনিস ছিল। প্রাচীন-বঙ্গীয়-সমাজের অন্যতম আনন্দব্যঞ্জক-উৎসব, এই

স্বীয় পল্লীর কর্ত্তৃত্ব ও কাঁসারী পাড়ার সংযাত্রা।

সংযাত্রা, মহাদেবের গাজন উৎসবের অন্তে বৎসরের শেষদিনে, সাধারণতঃ প্রাচীন-সম্ভ্রান্ত-পল্লীসমূহে অনুষ্ঠিত হইত। অনেকের মতে এই উৎসব, কোন অধুনা লুপ্ত বৌদ্ধ প্রথার নামান্তর। গাজন ও সংযাত্রা এই দুইটী ব্যাপারের সহিতই কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্মের যোগ দেখিতে পান। আমাদের কিন্তু উহা ঠিক আলোচ্য না হইলেও, অনুসন্ধিৎসুর কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য মাত্র ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম। বহুকাল হইতেই এই উৎসব, বাঙালীর অন্যতম প্রমোদকর-অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছে; সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণই, এই সংযাত্রার অভিনেতা নির্ব্বাচিত হয়—ও নানাবিধ সাময়িক ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত প্রহসন অভিনয় করিয়া, সাধারণের আনন্দ উদ্দীপিত করে; প্রাচীন-বঙ্গীয়-প্রথার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক হিসাবেই, তারকনাথ এই অনুষ্ঠানের পরিচালক পদ গ্রহণ করেন এবং ইহাকে লোকপ্রিয় করিবার নিমিত্ত আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। আজ, কাল প্রভাবে, কাঁসারীপাড়ার সেই সংযাত্রা লুপ্ত, অনেক পল্লী হইতেও এই ব্যাপার লোপ পাইতেছে, আধুনিক-রুচিপ্রিয়-বঙ্গবাসী রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রের মোহে, আপনাদের পুরাতন-প্রথাসকল ভুলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু এখনও এমন দুই একজন আছেন, যাঁহারা প্রাচীন দেশীয় প্রথার আন্দোৎসবের পক্ষপাতী; হয়ত কালে, তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ব্রতচারি-আন্দোলনের ন্যায় নূতনরূপ ধারণ করিয়া

ঐ প্রথা, পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে—আবার বাঙালী আপন গৃহাভিমুখী হইতে পারে। অচিরে সেই যুগ ফিরিয়া আসাও ভাবপ্রবণ-বঙ্গদেশে বিচিত্র নহে। তখনই বঙ্গবাসী মহাত্মা তারকনাথের এই সংযাত্রা পরিচালনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিতে পারিবে।

ধর্ম্মবিশ্বাসে তারকনাথ পরমবৈষ্ণব ছিলেন। হরি সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার অচলা প্রীতি ছিল। বৈষ্ণবজনোচিত তিলকাদিধারণ তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। ব্রাহ্মণের পদধূলি তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতেন, ও ঐ সকল পদরেণু তিনি পরম যত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিতেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে, তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করেন। এই পদধূলি-গ্রহণ সেকালে অভিজাত-কুলের একটী গৌরবের বিষয় ছিল। পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানী এককালে লক্ষ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রিত করিয়া, অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করান, ও উপযুক্ত বিদায় দান করেন, অনন্তর তাঁহাদের পদরেণু ভক্তি ভরে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র সঞ্চয় করিয়া সাবধানে রক্ষা করেন। এই পদধূলি-গ্রহণ-উপলক্ষ্যে যে সমারোহ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যে ব্রাহ্মণ যে দ্রব্য খাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে তাহাই ভোজন করান হয়,—ইহার বিশদ-বর্ণনা রাণীমাতার জীবন চরিতে লিপিবদ্ধ আছে; তাই এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। প্রবাদ মহারাজ

ধর্ম্মবিশ্বাস ও ব্রাহ্মণ-পদরজো গ্রহণ।

নন্দকুমার এবং বর্দ্ধমানের কোন রাজাও এইরূপ এককালে লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সমারোহ হয় নাই। অনেকের বিশ্বাস বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি এখনও রক্ষিত আছে। ঊনবিংশ-শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাব-প্লাবনে মজ্জমান-বাঙালীর পক্ষে ঐরূপ পদধূলি গ্রহণের চিন্তাও অস্বাভাবিক ছিল, কেবল তারকনাথ উহার ব্যতিক্রম-স্বরূপ অভিনব উপায়ে, ক্রমে ক্রমে উক্ত দুর্ল্লভ বস্তু সংগ্রহ পূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করেন। দৈনিক নিয়মিতভাবে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ তাঁহার প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল। একদিন একাদশজনের পদধূলি-লইবার পর, আর একজন ব্রাহ্মণ, কোনরূপেই সংগ্রহ না হওয়ায়, তিনি অগত্যা স্বীয় বাটীর দ্বাররক্ষক পাঠক-ব্রাহ্মণের শরণাগত হ'ন এবং ব্যাকুল-ভাবে পদধূলি লইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আপন প্রভুকে পদধূলি দানে অনিচ্ছুক পাঠক প্রথমতঃ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু অবশেষে ভক্তির মাহাত্ম্যে বিচলিত হইয়া তিনি তাঁহার অভিলাষ পূরণ করেন। এই ঘটনায় আধুনিক-রুচিপ্রিয়-বঙ্গসন্তানগণ হয়ত ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত রসবোধ তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিবে। এই ধনবত্তা-প্রাধান্যের যুগে এই ঘটনাটী অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ,—ধনমদে মত্ত মানব বর্ত্তমানে নির্ধনকে অবজ্ঞাত, পদমর্দ্দিত করিয়া

রাখিয়াছে; ধনহীন মানব যত গুণ সম্পন্নই হউক না কেন, যতই তাঁহার বংশমর্য্যাদা থাকুক না কেন, ধনীর নিকট আজ সে যেরূপ ভাবে অবনত, প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে সে তদ্রূপ ছিল না,—তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উক্ত ঘটনাটী; অবশ্য আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, আমাদের দেশে ধনমত্ততা একেবারেই ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ধন যেমন জাতিভেদের মাপকাটি হইয়াছে, ধনবত্তা যেমন গুণবত্তাকে পরাহত করিয়া সমাজে উন্নত আসন অধিকার করিয়াছে, সে যুগে সেরূপ ছিল না। তাই, মহাভারতের যুগে আমরা দেখিতে পাই, কপর্দ্দকহীন মহাত্মা বিদুরও কুরুপাণ্ডবের রাজ-সভায় সম্মানভাজন। তাহা ছাড়া, এই ঘটনাটীকে যাহারা হীন-চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের আরও কিছু শিক্ষনীয় আছে, তাহা পরলোকগত পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার-সম্মত; কোন এক ধনিভবনে আমন্ত্রিত বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকজন গণ্যমান্য ধনীর সহিত, বৈঠকখানায় টানাপাখার নিম্নে উপবেশন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক পশ্চিম-দেশীয় পত্রবাহক ধূলিমণ্ডিত পদে, ক্লান্ত দেহে, সেখানে উপস্থিত হইল; স্বভাবত দয়ালু বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাকে সুপরিচ্ছন্ন ফরাসে উপবেশন করাইয়া, বায়ু সেবনের সুবিধা করিয়া দিলেন। ইহাতে কয়েকজন ধনী বিরক্ত হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন;—"এই কার্য্যটী দোষের কিংবা দোষের নহে তাহা প্রাচীন ও আধুনিক মতে বিচার করিলে

দেখা যায় যে, এই ব্যক্তি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও জাতিতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উহারা আমাদের স্পৃষ্ট ভোজ্য ব্যবহার করেনা, সুতরাং প্রাচীন সামাজিক রীতিতে ইহারা উচ্চ সম্মানের পাত্র; আর আধুনিক মতের বিচারে এই ব্যক্তি, দশটাকা বেতন পায়, আমরা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, আমাদের অনেকেরই পিতা পিতামহ প্রভৃতি এইরূপ বেতনেই কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং উহার মর্য্যাদা তাঁহাদের অপেক্ষা কিসে কম, অতএব উহাকে অবজ্ঞা করা মানবোচিত নহে। মানব যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, মানবত্ব সকলেরই সমান থাকে, পদগৌরব বাহিরের বস্তু—মনুষ্যত্ব অন্তরের লুক্কায়িত সম্পদ, তাই কোন মানুষকে অবজ্ঞা করা মানবোচিত গুণ নহে—অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যত্ব অপরিবর্ত্তনীয় ও পুরুষপরম্পরাগত প্রতি মানবের গুপ্তধন। উহার সদ্ব্যবহার করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণভোজন তারকনাথের অত্যন্ত প্রিয়কার্য্য ছিল। এবিষয়ে কয়েকটী ঘটনা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতি ভক্তি সহকারে তিনি এই পুণ্যকার্য্য সমাধা করিতেন; ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ফেরিওয়ালাগণের মত "কি চাই, কি চাই," বলিয়া

ব্রাহ্মণভোজন-রীতি।

পরিবেশন করা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না। এইজন্য পরিবেশকগণ এক একটী পাত্রে বিভিন্ন ভোজ্যদ্রব্য লইয়া ভোক্তৃ-সকলের সম্মুখীন হইতেন, এবং যাঁহার যে দ্রব্য ভোজনের অভিলাষ, তাহা জানাইবামাত্র ভোজনপাত্রে অর্পণ করিতেন; যতক্ষণ না ভোক্তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইত, ততক্ষণ পরিবেশক তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অবারিতভাবে বিতরণ করিত;—এইরূপে ভোক্তার তৃপ্তি বিধান না হওয়া পর্য্যন্ত পরিবেশককে তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতে হইত। তারকনাথের গৃহে প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি এতদ্দেশীয় পরিবেশন প্রথার এক যুগোচিত অভিনব সংস্কার, উহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত ও অতীব মনোজ্ঞ। তাঁহার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার ভাবটী ইহাতে রমণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে ইহা পাশ্চাত্ত্য-পরিবেশন-প্রথার অনুরূপ মনে হইলেও ইহাকে তাহার অনুকরণ বলা চলে না। কারণ তারকনাথ সেই প্রথার সহিত পরিচিত ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য-রীতির পরিবেশক পাত্রে খাদ্য লইয়া ভোজনকারীর সম্মুখীন হইলে, তিনি স্বীয় অভিলাষ ও প্রয়োজনমত দ্রব্য স্বহস্তে তুলিয়া ল'ন। কিন্তু তারকনাথ-প্রবর্ত্তিত-পদ্ধতিতে ভোক্তাকে পাত্র স্পর্শ করিতে হইত না—এখানেই উক্ত প্রথার সহিত, ইহার পার্থক্য। ব্রাহ্মণজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল। কোন ব্রাহ্মণ সামান্য মাত্র ক্লেশ অনুভব করিতেছেন জানিতে পারিলে, তিনি মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার দুঃখ মোচন করিতেন।

তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ বহুলোক ভোজন করিতেন, উঁহাদের কেহ:কেহ রাত্রিতে রুটি ভোজন করিতেন বলিয়া পাচকগণ, বিভিন্ন প্রকার খাদ্যপাক-করণ জনিত কষ্টবোধ করিতেন। একবার তাঁহারা এবিষয়ে তারকনাথের নিকট অনুযোগও করিয়াছিলেন। তারকনাথ অনুযোগ শ্রবণ করিয়া, পাচক-ব্রাহ্মণগণের ক্লেশ লাঘব করিবার জন্য, রাত্রিতে সকলেরই রুটি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে ভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুতের কষ্ট হইতে অব্যাহতি-লাভ করিয়া, তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন। এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে, তাঁহার ভবনে উচ্চ নীচ ভেদে আহারের তারতম্য ছিল না ; আপনারা যেরূপ ভোজন করিতেন, কর্ম্মচারী বা আগন্তুকদের নিমিত্তও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। অনুকরণ-যোগ্য প্রাচ্য দেশীয় রীতি সমূহের অন্যতম, এই সুন্দর রীতি সত্যই প্রশংসনীয় ; অনেক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত-বংশে এই উত্তম নিয়মটী প্রচলিত থাকিলেও, আজকাল নানাস্থানে ইহার ব্যাভিচার দেখা যাইতেছে। কিন্তু খুবই সুখের বিষয় এই যে, তারকনাথের বংশধরগণ এখনও একই ভাবে তাঁহার—এই সকলের প্রতি সমভাব-সূচক—নিয়মটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক মৌখিক-সাম্যবাদ-প্রচার-কারিগণের এই আদর্শ প্রথাটি হইতে অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে। ব্রাহ্মণ ভোজনের সকল জিনিসই যাহাতে পবিত্র ভাবে রক্ষিত হয় সে বিষয়ে তারক নাথের প্রখরা দৃষ্টি ছিল। একবার ব্রাহ্মণ-

ভোজনের সময় ক্ষীরের হাঁড়িতে, কোন পরিবেশকের পদস্পর্শ হইয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া, পতনশীল ক্ষীর অন্যান্য মিষ্ট-দ্রব্যাদির সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া যায় ; তারকনাথ ইহা জানিতে পারিয়া, সেই ক্ষীরের সম্পর্ক-জাত সকল দ্রব্যই পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করেন। পুনরায় নূতন করিয়া সকল দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

হরিনাম-প্রচার তারকনাথের জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সুখচরের বাগানবাটীতে গমন করিবার পথে, তিনি প্রতিবারই খড়দহের নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামী-কুলোদ্ভব-গুরুবাটীতে কিছুকাল যাপন করিয়া, শ্রীগুরু-পদ-বন্দন ও প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই ব্যবস্থা মত প্রতি মাসে সেইদিন সেইখানে অষ্টম প্রহরের আয়োজন হইত ; উহা সমাপ্ত হইবার পর তারকনাথ, গায়কবর্গের সহিত শ্যামসুন্দরের শ্রীমন্দির-প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক উদ্যান বাটীকায় গমন করিয়া, প্রশান্তচিত্তে অবসর অতিবাহন করিতেন। প্রত্যেক সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময়ও নাম কীর্ত্তনের বিরাট আয়োজন হইত। এই প্রকার গ্রহণকালে প্রতিবারই শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, পুরশ্চরণ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া, তিনি গ্রহণান্তে স্নান ও গৃহাদি সুসংস্কৃত হইবার পর, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিতেন।

গুরু বাটীতে অষ্টম প্রহর।

বয়স্যগণের হিতৈষণা।

বন্ধু ও বয়স্যগণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তারকনাথের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বন্ধুগণ যাহাতে সৎপথগামী হ'ন, তজ্জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কয়েকজন বয়স্য অজ্ঞাত কারণে রাত্রিতে বাটীর বাহিরে গমন করেন, ইহা জানিতে পারিয়া, তিনি রাত্রি নয়-ঘটীকার সময়েই দ্বার বন্ধ করিবার নিয়ম করেন। ইহাতেও কার্য্য সুসিদ্ধ হইল না, বয়স্যগণ প্রাচীর অতিক্রম করিয়াও কার্য্য-সাধন-নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন; তখন তিনি এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন—অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বাটীর বহির্ভাগের পথের উপর তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া, বন্ধুগণের প্রতীক্ষা করিতেন। কোন কোন দিন বন্ধুগণ তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করিতেন। পরিহাসপটু তারকনাথ মন্থরগতিতে উপস্থিত হইয়া, সহসা বন্ধুর অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন; ইহাতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ বন্ধু জীবনে আর কখনও রাত্রিতে বাটীর বাহিরে যাইতেন না,—এইরূপে সরসভাবে বন্ধুগণের চরিত্রসংশোধন করিয়া তিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। এই ঘটনাটীতে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের একটী কার্য্য আমাদের মনে উদিত হয়। তিনি সংস্কৃতকলেজে অধ্যক্ষ পদারূঢ় হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে যথাসময়ে আগমন-রীতি প্রবর্ত্তিত করেন. তৎপূর্ব্বে অধ্যাপকগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত যখন খুসী বিদ্যালয়ে আসিতেন; বিদ্যাসাগর

মহাশয় নিয়ম-প্রবর্ত্তিত করিবার পরও, অনেক বৃদ্ধ অধ্যাপক পূর্ব্বাভ্যাসই অনুবর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদিগকে সংশোধিত করিবার নিমিত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন; তিনি প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে স্বয়ং দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এবং কাহারও আসিতে বিলম্ব দেখিলে, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিতেন, "এই আসিলেন নাকি?" এইরূপে ক্রমে ক্রমে অধ্যাপকগণ অযথা বিলম্ব করিয়া আগমন পরিত্যাগ করিলেন,—বিদ্যা-পীঠের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। তারকনাথ ও বিদ্যা-সাগর অবলম্বিত উপায়ের পরস্পর অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আমাদের মনে হয়, তারকনাথের উপায়টী অনেকটা সরস। বন্ধুগণ ইহাতে বিদ্বেষভাব-পোষণ না করিয়া পরিণামে তাঁহার ভক্ত হইয়া দাঁড়াইত। এইরূপে তাঁহাদের জীবনের আমূল-পরিবর্ত্তন সাধিত হইত।

বয়স্যগণের কদভ্যাস-বিদূরণ ও মোসাহেবদ্বয়ের কাহিনী।

বয়স্যগণের সহিত তারকনাথ একত্রে গঙ্গাস্নানে যাইতেন; পথে পল্লী-বিশেষে বারান্দায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার স্পৃহা, কোন কোন বন্ধুর মনে প্রবল থাকিলেও তাঁহার ভয়ে কেহই উক্ত কর্ম্মে সাহসী হইতেন না। একদিন একজন বন্ধু আত্মনিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া, ঘাড়ে ব্যথার ভান করেন, এবং এইরূপে, কৌশলে, উদ্দেশ্য-সাধন করিয়া লইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু সুচতুর তারকনাথ পূর্ব্বাহ্নেই বন্ধুর মতলব

অবগত হইয়া, উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন ; তিনি মিঠেকড়া ভাবে বন্ধুকে বলিলেন, "উপরে চাহিলেই ঘাড়ের রোগ সারবে"—সকলের সম্মুখে আপনার হীন উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, বন্ধু তীব্রভাবে মর্ম্মাহত হইয়া আপনার চিত্ত হইতে কামনার লেশমাত্র পরিত্যাগ করিতে কৃতযত্ন হন, ও ক্রমশঃ আত্মশুদ্ধি করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন ; প্রকৃত সজ্জনের আশ্রয় লইলে, মানুষ এইভাবেই পরিবর্ত্তিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন। কদভ্যাস সহসা পরিত্যাগ করা যায় না, উহা করিতে হইলে দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। পাঠকগণ নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী হইতে মানুষ যে সামান্যক্ষণের জন্যও অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহার আভাস পাইবেন।

পূর্ব্বকালে কোন এক ধনীর দুইজন বয়স্য ছিল। উহাদের একজনের মস্তকে টাক ও অপরের পৃষ্ঠদেশে দদ্রু থাকায়, একজন অবিরত মস্তকে হাত বুলাইত, ও অপরে নিরন্তর পৃষ্ঠদেশ কণ্ডূয়ন করিত। উহাদের প্রভু, অভ্যাস-বিদূরণ করাইবার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করেন। প্রত্যহ অল্পসময়ও যদি উক্ত কদভ্যাস হইতে বিরত থাকা যায়, তাহা হইলে কালে, উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি বয়স্যদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা নৌকাযোগে নদীপারে গমন করিয়া পুনরায় নৌকাযোগেই ফিরিয়া আইস, ইতিমধ্যে তোমাদের কেহই

মস্তক বা পৃষ্ঠে হাত দিতে পারিবে না, আমার বাক্য রক্ষা করিলে পুরস্কার পাইবে; প্রকৃতপক্ষে বাক্য-রক্ষা করিলে কিনা, তাহার সাক্ষীস্বরূপ দ্বারবান্‌কে পাঠাইতেছি।” দ্বারবান্‌কে তাহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া হইল; নৌকা যথাসময়ে পরপারে উপস্থিত হইল; ইতিমধ্যে অবশ্য কেহই মস্তক বা পৃষ্ঠে হাত দেন নাই, কিন্তু স্থলভাগে অবতীর্ণ হইয়াই যাঁহার পৃষ্ঠে দক্রু ছিল, তিনি একটী অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিলেন।

তিনি বলিলেন, “আমি একবার কোন জঙ্গলময় স্থান দিয়া যাইতে ছিলাম; এমন সময়, একটী ভল্লুক উপস্থিত হইল, ও আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সম্মুখের পা দুইটী পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়া, এইরূপ ভাবে আঁচড়াইতে লাগিল।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিজের হস্তদ্বয় বিপরীত ভাবে পৃষ্ঠদেশে দিয়া কণ্ডূয়ন আরম্ভ করিলেন। “আমার নিকট একটী লাঠিমাত্র ছিল, প্রচণ্ড-বিক্রমে ভল্লুকটিকে নিক্ষেপ করিয়া, সেই লাঠিদ্বারা তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিলাম”। যাহার মস্তকে টাক ছিল, তিনি, এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, সহসা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, পদধূলি-গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা মস্তকে মাখিতে লাগিলেন, ও বলিতে লাগিলেন, “ওঃ তোমার এত সাহস! ধন্য! তুমি ধন্য! দাও, দাও, পায়ের ধূলো দাও”;—এই বলিয়া পুনঃপুনঃ ধূলি গ্রহণ ও মস্তকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা

উভয়েই আপনাদের কদভ্যাস ঠিক বজায় রাখিলেন,—পশ্চিম দেশীয় দ্বারবান্ চাতুরী বুঝিতে পারিল না—ফিরিয়া গিয়া প্রভুর বাক্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দান করিল। যাহাহউক এই গল্পটী হইতে আমরা বুঝিতে পারি, সহসা কদভ্যাস পরিত্যাগকরা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার—নিয়মিতভাবে অবিরাম যত্ন করিলে, তবে, মানুষ হয়ত এই অভ্যাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। "অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব"—এই মহাজন-বাক্য হইতেই আমরা অভ্যাসের গুরুত্ব বুঝিতে পারি। একমাত্র মহতের সংসর্গেই অভ্যাস ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে পারে—সজ্জনের ক্ষণিক সঙ্গও ভবপারাবারপারের তরীস্বরূপ। তাই তারকনাথের ন্যায় মহতের স্থায়িসঙ্গদ্বারা যে, দুঃশীল বন্ধুগণের চরিত্র সংশোধিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

বয়স্যগণ যাহাতে আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়া, কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন, সে বিষয়েও তারকনাথের দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন দোকানের ভারপ্রাপ্ত-কর্ম্মচারিগণ বৎসরে একবার করিয়া, আপনাদের হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করাইতে, তারকনাথের নিকট আসিতেন। সেই সময়ে তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ হিসাব, প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ করাইবার জন্য, প্রধান প্রধান বয়স্যগণের দ্বারা সুপারিশ করাইতেন। এই সময় কোন কোন কর্ম্মচারীর হিসাব,

বন্ধুগণের জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দৃষ্টি।

প্রথমে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে, বয়স্থ গণের কাহারও কাহারও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটিত। কোনও একজন বয়স্থ,তারকনাথকে বিশেষ একজন কর্ম্মচারীর হিসাব, প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অনুরোধ করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার কিছু হবে তো? যদি হয় তবেই আগে দেখ্‌বো।" প্রসিদ্ধ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট একব্যক্তি অভিযোগ করেন যে, আপনার অমুক কর্ম্মচারী সামান্য বেতন পায়, কিন্তু সে এত জমি কিনিয়াছে ও এরূপ সুন্দর বাটী করিয়াছে ইত্যাদি; ইহাতে তিনি বলেন, "ইহা তো সুখের কথা, আমার কর্ম্মচারী, আমার কার্য্য রক্ষা করিয়া, যদি কৌশলে নিজের উন্নতি করিয়া লইতে পারে, তবে সে তো আমারই গৌরব।"

প্রাচীন যুগে আদর্শ হিন্দু মাত্রই আশ্রিতগণের উন্নতির প্রতি, এইরূপই যত্নশীল থাকিতেন। আমার আশ্রয়ে একজন করিয়া খাইতেছে,—ইহা তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল। দশজনকে মানুষ করা, দশজনের সংস্থানকরিয়া দেওয়া, তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারের প্রভু মদনমোহন দত্ত, তাঁহাকে তদীয় যত্নে লব্ধ, লক্ষ মুদ্রাই অর্পণ করেন। তিনি বলিয়া ছিলেন, "রামদুলাল স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে উহা লাভ করিয়াছে, সুতরাং ও টাকাতে আমার কোন সত্ব নাই"। উক্ত মুদ্রা হইতেই রামদুলাল অতুল বিভবের অধিকারী হ'ন,

—ইহাতে মদনমোহন চিরকাল গৌরব অনুভব করিতেন। ঢাকা-নিবাসি-প্রসিদ্ধ-ব্যবসায়ী জীবনবাবুর দৌলতেই ভাগ্য-কুল রায়-বংশের গৌরব-প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাপ্রসাদ ধনবান্ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন—ইহা জীবনবাবুরও চিরদিনের আনন্দদায়ক-স্মৃতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শরণাগত ব্যক্তিকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা প্রাচীন হিন্দু নীতির আদর্শ। আজকাল আমরা এই নীতি হইতে অনেকটা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি;—আজকাল অনেক ধনবান্ ব্যক্তি, আপনার অধীনস্থ ব্যক্তির "উপরি উপায়ের" সন্ধান পাইলে বিরক্ত হ'ন, এমন কি তাহাকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করিতেও দ্বিধা করেন না, কিন্তু এবিষয়ে প্রভু, ভৃত্য উভয়েরই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। ভৃত্যের কর্ত্তব্য প্রভুর উন্নতি, বিধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা, আর প্রভুর কর্ত্তব্য যাহাতে ভৃত্য স্বীয় পরিবার-পোষনের উপযুক্ত বৃত্তি সদ্‌ভাবে তাঁহার আশ্রয় হইতে উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। স্বীয় পরিবার-পোষণ না করিতে পারিলে, সে প্রভুর জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে পরিশ্রম করিতে পারিবেনা, হয় তাহাকে অবৈধ উপায়, নয়তো অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে।

সুকৌশলে তারকনাথ ভৃত্যগণকে স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেন; তাঁহার সময় গৃহে টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল; গ্রীষ্মের সময় একজন কুলি প্রতি রাত্রিতে তাঁহার কক্ষে পাখা



৺বিনোদবিহারী প্রামাণিক

টানিত। এক রাত্রিতে উক্ত পাখাকুলি অবসন্ন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে; তারকনাথ সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিতে পা'ন; তিনি কুলিকে বলিলেন আমার "ঘুম আস্‌ছেনা আর, পাখার দড়ি হাতে করিলেই তোমার ঘুম আসে, দাওতো তোমার দড়ি, আমি একবার টানি, দেখি, যদি "ঘুম আসে",—ইহাতে লজ্জিত হইয়া, পাখাকুলি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্নবান্ হয়।

পাখা কুলির কাহিনী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেব-দ্বিজের ন্যায় গোজাতির প্রতিও তারকনাথের অচলা ভক্তি ছিল। একবার এক কসাই কয়েকটী গাভী লইয়া, তারকনাথের বাটীর সম্মুখ দিয়া গমন করিতে ছিল; এমন সময়, একটী গাভী ছুটীয়া আসিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে। কসাইও পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক বাটীতে উপনীত হয়। তারকনাথ গোলযোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে আসিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন; তিনি কোনমতেই কসাইকে গাভী প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না।

গোসেবা ও ফটকা গাইয়ের কাহিনী।

কহিলেন "এই গাভী আমার শরণাগতা, ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য, আমি সর্ব্বস্ব পণ করিতেও কুণ্ঠিত নহি।" শাস্ত্রে আছে যিনি লোভ বা ভয় বশতঃ শরণাগতকে পরিত্যাগ করেন, তিনি মহাপাপে পতিত হ'ন। এই শাস্ত্রবিধি স্মরণ করিয়া, তারকনাথ আপন প্রতিজ্ঞায় অচল থাকিলেন; কসাই নিরুপায় হইয়া উপযুক্ত মূল্যমাত্র লইয়াই প্রস্থান করিল। তারকনাথ পরম যত্নে গাভীটীকে পালন করিতে লাগিলেন। ঐ গাভী তাঁহার গৃহে "ফটকা গাই" নামে কথিত হইত; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া উহা বহুবার গর্ভ ধারণ করে। শুনা যায় যে, স্বীয় পরিত্রাতার প্রতি তাহার চিরদিন একটা আকর্ষণের ভাব ছিল; যেন মনে হইত, সে তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ; তাই যেন, রক্ষাকর্ত্তার ঋণ পরিশোধের জন্যই সে আজীবন প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। কামধেনুর মতই সে সকল সময়ই দোহন কর্ত্তার প্রতি দয়াবতী ছিল। তাহার দুগ্ধপ্রার্থী হইয়া দোহক কখনও বঞ্চিত হইত না; যত বারই দোহন করা হউক না কেন, ততবারই সে কিছু দুগ্ধ দান করিবেই; সপ্তমাতার অন্যতমা ধেনুমাতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাত্রেরই পরমারাধ্য বস্তু;—শিশুর প্রাণরক্ষা-কর্ত্রী এই গাভী মাতার প্রতি, সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য ও স্বীয় জননীর মতই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। ভারতের প্রাচীন ঋষি ও কবির স্তোত্রগান, গাভীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। রাজা দীলিপ আপনার প্রাণের বিনিময়েও, গাভীর প্রাণ রক্ষা

করিতে প্রস্তুত ছিলেন। গোজাতির প্রতি প্রাচীন ভারতের শ্রদ্ধা বর্ণনাতীত ; গোজাতির উন্নতি অবনতির সহিত জাতির উন্নতি, অবনতি, ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাই প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুর আদর্শ-প্রতীক্-তারকনাথের গোজাতি-প্রীতি, তাঁহার অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃই উৎসারিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-স্বরূপ। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগে ভারতের স্বাভাবিক গো-ভক্তির প্রবল ব্যাভিচার চলিতেছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে নব-দীক্ষিত বহু খ্যাতনামা-নব্যযুবক, গোমাংস ভক্ষণকে, কুসংস্কার দূরীকরণের অন্যতম উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং যুগধর্ম্ম তারকনাথকে গোরক্ষণ বিষয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল, ইহা বলা চলে না। তাঁহার আন্তর ধর্ম্মই, তাঁহাকে উক্ত কর্ত্তব্য-পালনের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার এই আদর্শ হইতে বর্ত্তমান যুবকগণ, জাতীয় সমুন্নতির একটী প্রয়োজনীয় কর্ম্মধারার সন্ধান পাইবেন,—গোজাতির সংরক্ষণ ও সমুন্নয়ন-কার্য্য, ভারতের মৃতপ্রায় শরীরে পুনর্জীবনের সঞ্চার করিয়া দিবে। তারক-নাথের উপরোক্ত কার্য্যটীতে, আমরা প্রাচীন নৈষ্ঠিক ভারতীয়ের আর একটী মহৎ গুণ বা ধর্ম্মের পরিচয় পাই,—উহা আশ্রিত-রক্ষণ। রাজশ্রেষ্ঠ শিবি শরণাগত ক্ষুদ্র কপোতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই ; তাঁহার উক্ত সুমহৎ কর্ম্মের প্রশংসায় প্রাচীন ভারত মুখরিত। তারকনাথের কার্য্যও

তাঁহার কার্য্যের সহিত সমশ্রেণীতে তুলিত হইবার যোগ্য। এই একটীমাত্র কার্য্যের দ্বারাই, তারকনাথ অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন; তারকনাথের প্রায় সমসাময়িক আর একজন মহাত্মাও, এই প্রকার কসাইয়ের কবল হইতে গোমাতাকে উদ্ধার করিয়া, অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত, মহাভারতের বঙ্গানুবাদক, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়; তারকনাথের বাটীর অনতিদূরেই তাঁহার আবাস ভবন; তাঁহার পিতা নন্দলাল সিংহের টিপ্পনীই গুরুচরণের বনতি গায়ে দেওয়া ব্যাপারের মূল। মহাত্মা কালীপ্রসন্নের গোরক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটী, কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আশা করি এই সূত্রে, তাহার উল্লেখ, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সিংহ মহাশয়, গুরুদেবকে প্রত্যহ প্রভাতে, একটী স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া প্রণাম করিতেন। কোন কার্য্যোপলক্ষে, তিনি গুরুদেবকে একটী গাভী দান করেন। গাভীর পোষণের নিমিত্ত গুরুদেব নিয়মিত ভাবে মাসহারা লইয়া যাইতেন। কিন্তু গাভী পালন তাঁহার নিকট বিরক্তি-কর বোধ হওয়ায়, তিনি একজন কসাইকে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন;—পূর্ব্ববৎ মাসহারা আদায় বন্ধ করেন নাই। একদা গাভী কসাইয়ের হস্তচ্যুত হইয়া পলাইয়া আসিয়া, কালী-প্রসন্নের বাটীতে প্রবেশ করে। তিনি সংবাদ পাইয়া কসাইকে আহ্বান পূর্ব্বক, সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া, গুরুদেবের কীর্ত্তি-অবগত হ'ন; অনন্তর কসাইকে উপযুক্ত-

প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক

মূল্য দিয়া, তিনি গাভীটীকে গ্রহণ করেন, ও যথাপূর্ব্ব পালন করিতে থাকেন। পরদিন, গুরুদেব বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি প্রণামীদানের পরিবর্ত্তে, তাঁহার শিখাটী কর্ত্তন করিয়া ল'ন। তদবধি ভণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিখা কর্ত্তন তাঁহার নিত্যকর্ত্তব্যে পরিণত হয়; এই শিখাকর্ত্তন কাহিনীর মূলে কতটুকু সত্যতা নিহিত আছে, তাহা জানিনা, কিন্তু এই কাহিনীর সারভাগ—গোরক্ষণ ব্যাপারটী—সাধারণের অনুকরণীয়। তারকনাথের গোরক্ষাকাহিনীর সহিত সমতুল্য বিধায়, ইহা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম; উভয় কাহিনীই তুল্য শিক্ষাপ্রদ।

পরচর্চ্চায় বিরক্তি।

পরচর্চ্চায় তারকনাথ অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন; এই মৃতপ্রায় জাতির, পরনিন্দা পরচর্চ্চা, একপ্রকার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; কিন্তু তারকনাথ ইহার ব্যতিক্রম। একবার স্বীয় ভবনে কয়েক-জনকে পরচর্চ্চা করিতে দেখিয়া, তিনি বিনীতভাবে উহা করিতে আপত্তি করেন। উহার বদলে, তিনি ধর্ম্ম বা শাস্ত্রচর্চ্চার উপদেশ দান করেন, এবং যুক্তি-সঙ্গতভাবে উভয় প্রকার চর্চ্চার ফলাফল বুঝাইয়া দেন। সামান্য ধর্ম্মচর্চ্চাও মহাফলদায়ক;—ক্ষণকালের ধর্ম্মচর্চ্চা মনুষ্যকে পার্থিব আসক্তি পরিহার করাইয়া, মুমুক্ষুত্ব প্রদান করিতে সমর্থ;—জগতে ইহার উদাহরণও বিরল নহে। তারকনাথ স্বয়ং, ব্রাহ্মণগণের সহিত সদালাপ

করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। জীবনের শেষাংশে কয়েক বৎসর, অবিরাম ধর্ম্মচর্চ্চায় কাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি শান্তি লাভ করিতেন। এই সময় গো-ব্রাহ্মণের সেবায় তিনি অধিক সময় নিয়োজিত করেন। তাঁহার গোমূত্রমর্দ্দনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে;—তৈলের বিনিময়ে প্রত্যহ, সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গোমূত্র মর্দ্দন করিয়া, তিনি স্বস্তি বোধ করিতেন। কেবল মর্দ্দন নহে, পরন্তু পরমপবিত্রবোধে গোমূত্রপান, তাঁহার নিত্য অভ্যাস মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গোমূত্র বহু ব্যাধিনাশক, ইহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মত;—পঞ্চগব্য অন্যতম শুদ্ধি-কারক দ্রব্য বলিয়া গণ্য ও গোমূত্র উহার একটী উপচার; সুতরাং হিন্দুর নিকট এই বস্তুটী পরম পবিত্র ও প্রয়োজনীয়। গোময়ের বীজাণুনাশকগুণ আজকাল চিকিৎসকগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। আজ আমরা আমাদের গৃহজাত অতি সুলভ, এই বস্তুটীর প্রতি, বীতস্পৃহ হইয়া বিদেশীয় ফিনাইল প্রভৃতি দ্রব্যে আকৃষ্ট হইতেছি,—ইহা অতি দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

বদান্যতা।

দান তারকনাথের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মস্বরূপ ছিল। যে দিন তিনি দান না করিতেন, তাঁহার সেইদিনই যেন বিফল হইয়া গেল মনে হইত। তাঁহার দানের আর একটী মহৎ বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোনপ্রকার পার্থিব আসক্তির বশীভূত হইয়া দান করিতেন

না। প্রকৃত নিষ্কামভাবে, শাস্ত্রোক্ত সাত্ত্বিক দানই তিনি করিতেন, এই দান বিষয়ে, তিনি স্থান, কাল, পাত্র, ভেদ না রাখিয়া, প্রকৃত প্রার্থীর প্রার্থনা যথাসাধ্য পূরণ করিতেন। দান তাঁহার আন্তরিক সদ্ভাবের বহিঃপ্রকাশমাত্র ছিল; উহাতে কোনপ্রকার নাম যশের লেশমাত্র থাকিত না। তাই, যখন বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আয়ের সামান্য খর্ব্বতা ঘটে, তখন একদিন তিনি তাঁহার পৌত্রগণকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর ভাই! এবার যেতে পারলেই বাঁচি, আর তেমন আয় নাই যে, প্রাণ ভরে দান করি, তাই আর বেঁচে থাক্‌তে মন চায় না।" এই কথা কয়টীতেই তাঁহার দানশীলতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দানের কাহিনীসমূহ তাঁহার অন্তঃস্তল-প্রবাহিতা দয়ারূপিণী স্রোতস্বিনীর এক একটী লহরী,—বাস্তব জগতে উহারা অতুলনীয়—উহারা এই মরজগতে স্বর্গীয় ভাবের প্রবাহ মাত্র। এই শ্রেণীর দাতৃগণই, এই পাপ পঙ্কিলা ধরণীকে, সুরজন-সেবিত-নয়নাভিরাম ত্রিদিবের নন্দন-কাননে পরিণত করেন। দাতাই প্রার্থীর নিকট দানগ্রহণরূপ মহৎ কার্য্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ; প্রার্থী অনুগ্রহ পূর্ব্বক, তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে মহদুপকৃত করিতেছেন,—এই ছিল,তাঁহার দানরূপ-সৎকর্ম্মের মর্ম্ম কথা। প্রকৃত হিন্দুর দান-কর্ম্মের মর্ম্মবাণীই এইরূপ। বর্ত্তমান যুগে দানকারী আপনার কর্ম্মের মহিমায় অভিভূত হইয়া পড়েন,—বিজ্ঞাপনের ঢক্কা নিনাদে তাঁহার দানবার্ত্তা বিঘোষিত হয়,—তিনি দান করিয়া

একজনের মহোপকার করিলাম মনে করিয়া, গৌরবানুভব করেন, কিন্তু আপনার অন্তরের দিকে তাকাইয়া দেখেন না, যে, উহাতে তাঁহার কতখানি কলুষ বিনাশ প্রাপ্ত হইল ;—প্রার্থী, নীলকণ্ঠের গরলপানের মত, তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার কতখানি পাপকে, আপনার দেহে সঞ্চারিত করিয়া হইলেন ;—যদি দাতার ইহা ধারণা করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই প্রার্থীর উপকার করিলাম, একথা ভাবিয়া, আহ্লাদে আত্মহারা হইতে পারিতেন না। বরং আপনি অনেকখানি নিষ্পাপ হইলাম ভাবিয়া আনন্দানুভব করিতেন। দান পাপনাশক,গ্রহণ পাপপোষক, তাই যোগশাস্ত্রে, সাধককে দান গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপ্রতিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেই, নিষ্পাপমনুষ্য জন্ম-জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিতে পারে,—তখন তাহার মনে হয়, এই পৃথিবীতে সে কতবার যাতায়াত করিয়াছে, তাই, আর তাহার গমনাগমনের ইচ্ছা হয় না,—তাহার মোক্ষলাভের প্রবল বাসনা জন্মে, ও চরমে সে সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারে। যে জলাশয়ের জল পঙ্কিল, তাহার তলদেশ যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, যে মানুষের মন পাপ-ভারাক্রান্ত, তাহারও তেমনই পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ হয় না।—মনের উপর হইতে যতই পাপের স্তর উঠিয়া যাইতে থাকে, ততই মানুষ জন্মান্তরের কথা মনে করিতে সমর্থ হয়,—ও তাহার মুমুক্ষুত্ব জন্মে। তাই

যোগীর ন্যায়, সৎব্রাহ্মণও কলুষ-বহুল মানবের দান গ্রহণ করেন না, বরং দান করিয়া আনন্দ লাভ করেন। তারকনাথের দানধর্ম্মের মূলে দান ও প্রতিগ্রহ-বিজ্ঞানের এই রহস্য নিহিত ছিল। তাই কৃতাঞ্জলি হইয়া, সশ্রদ্ধভাবে দান, ও প্রার্থীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপ ছিল। চিরজীবন তিনি এই মহদ্ভাবই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,—নাম বা যশের আকাঙ্ক্ষায়, তিনি দান করেন নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কয়েকটী অলৌকিক ব্যাপার।

তারকনাথের পিতামহ ও পিতার সম্পর্কিত কয়েকটী অলৌকিক কাহিনী, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে;—তারকনাথের আমলেও তদীয় ভবনে, কয়েকটী অলৌকিক-ব্যাপার-সংঘটীত হইয়াছিল; এস্থলে, উহাদেরই দুইটীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রবাদ, একটী ব্রহ্মদৈত্য তারকনাথের বাটীতে বাস করিতেন। তারকনাথের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইত; তাঁহার নিকট হইতেই তিনি, নানা বিষয়ের প্রেরণা লাভ করিতেন, এবং ব্যবসায়ের

উন্নতির মূলেও, তাঁহার ইঙ্গিত নিহিত ছিল। যদিও এই সকল ব্যাপার খুব গোপনেই সংঘটিত হইত, তবুও কোন কোন সময়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে ইহা ব্যক্তিবিশেষের গোচরীভূত হওয়ায়, সাধারণের জ্ঞাত হইবার সুযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। আর একটি অদ্ভুত ঘটনা, পুংছাগের দুগ্ধদান, বৃষদুগ্ধের মত পুংছাগদুগ্ধ অসম্ভব বস্তু হইলেও তারক নাথের ভবনে উহা সম্ভব হইয়াছিল ; একটি পুংছাগ তাঁহার বাটীতে পালিত হইত, উহা প্রত্যহ এক পোয়া পরিমাণ দুগ্ধ দান করিয়া, সাধারণকে বিস্ময়াভিভূত করিত। এই ঘটনা আপনার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি এখনও বর্ত্তমান আছেন। এই ঘটনাটিকে, সাধারণ, অবিশ্বাসজনক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। সময়ে সময়ে প্রকৃতি-মাতার নানারূপ খেয়ালের পরিচয়, আমরা পাইয়া থাকি ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তুরস্কদেশীয়া কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পুরুষত্ব প্রাপ্তির কথা, আমরা সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম ; সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডেও ঐরূপ একটি ঘটনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে (১)। কৌতূহলী পাঠক সংবাদপত্রের স্তম্ভে উহার বিবরণ পাঠ করিয়া, আপনার ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন। আমরা এখানে ঐ সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করি। কেবল-মাত্র প্রকৃতির রাজ্যে অসম্ভব ব্যাপার ঘটাও যে বিচিত্র নহে,

(১) Amrita Bazar Patrika. 31st. Aug. 1936.

তাহা সমর্থন করিবার নিমিত্তই, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দুইটী উল্লেখ করিলাম। বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব মানবের ক্ষুদ্র-জ্ঞানে, যাহা সম্ভব নহে বলিয়া মনে হয়, তাঁহার অসীম-মহিমায় তাহা স্বতঃই সম্ভব হইয়া পড়ে; এই বিষয়ে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও মথুরবাবুর কাহিনী, আমরা সাধারণকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। মথুর বাবুর মতে ভগবান্ অসম্ভব কার্য্য করিতে পারেন না, তিনি একই বৃক্ষে সাদা ও লাল উভয় প্রকার ফুল ফুটাইতে পারেন না; রামকৃষ্ণদেব উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের দ্বারা সকল কর্ম্মই সম্ভবপর; তিনি ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই, একই বৃক্ষে সাদা ও লাল ফুল ফুটাইতে পারেন—মথুরবাবুর উক্ত বাক্য সত্য বলিয়া ধারণা হয় নাই; কিন্তু পরদিন পরমহংসদেব একই জবা বৃক্ষের, একই শাখায় বিকশিত, শ্বেত ও লোহিত পুষ্প, তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি অতি সাবধানে উহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া, বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া, পরমেশ্বরের অসীমভাবে অভিভূত হইয়া, তিনি যে অঘটন-ঘটন-পটু তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হ'ন। এই সকল ঘটনা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অনন্ত শক্তিমান্ লীলাময় পরমেশ্বরের রাজ্যে, অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। মানব আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে, যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহাই তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়; যিনিই জ্ঞান-মহার্ণবের অসীম-বিশালতা

উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই, আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের গৌরবানুভব করিতে পারেন না। স্যার আইজাক্ নিউটনের ন্যায় মনীষীও বলিতেন, "আমি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরভাগস্থ উপলরাজি সংগ্রহ করিতেছি, মহাসমুদ্র আমার সম্মুখে অক্ষুন্ন রহিয়াছে, উহার কণিকামাত্রও স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

শেষ জীবন

জীবনের শেষদশায় তারকনাথ কয়েক বৎসর অবিরাম ধর্ম্মচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতে থাকেন ; এই সময়, দিবসের অধিকাংশ কাল, তদ্গত ভাবে, ভগবচ্চিন্তনে নিযুক্ত থাকাই তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম ছিল। জীবনরক্ষার নিমিত্ত যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণ আহার্য্য গ্রহণ করিতেন ;—যৌবনাবস্থা হইতেই, তিনি ভোগ বিলাসে পরাঙ্মুখ ছিলেন,—একথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে ; যে, অল্পপরিমাণ ভোগ, তাঁহার অভ্যস্ত ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহাও বিসর্জ্জন করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় জীবনের আদর্শ, বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করেন ; কিন্তু অতীতের বানপ্রস্থাশ্রমীর সহিত তাঁহার বিরাট পার্থক্য ছিল,—এই পার্থক্যই তাঁহার অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিত ; অতীতের বানপ্রস্থাশ্রমী সংসারের কোলাহল হইতে সুদূরে—বিহগ-কূজন-মুখরিত, পেলব-পল্লবরাজি-সুশোভিত, রমণীয় তরুকুঞ্জে, কলনাদিত স্রোতস্বতীর তটদেশে, পর্ণকুটীরে, ত্যাগী ঋষি-

জন-সমাজে, বাস করিতেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাঁহার অবলম্বিত আশ্রম-ধর্ম্ম-পালনে সহায়তা করিত; যোগিজন-সাহায্যে তাঁহার চিত্ত প্রশান্তিময় ত্যাগের রাজ্যে ধীরে, ধীরে, প্রবিষ্ট হইত; অন্তকালে সহজেই ভগবৎসত্তায় লীন হইবার স্বর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া, তিনি ধন্য হইতেন; কিন্তু তারকনাথের বানপ্রস্থাশ্রম সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত ছিল। সেখানে তপোবনের সেই—ঐশ সুন্দর ত্যাগের বিনিময়ে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রবল প্রাচুর্য্য অনুক্ষণ বর্ত্তমান থাকিত; সাধারণ যোগীর চিত্তও ইহাতে বিভ্রান্ত হওয়া, কিছুমাত্র বিচিত্র নহে,—সংসারীর তো কথাই নাই—কিন্তু তারকনাথ ছিলেন বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, পঙ্কমধ্যচারী পাঁকাল মাছের মতই ছিল, তাঁহার অদ্ভুত প্রকৃতি, তাই সংসারের শত কোলাহল ও পৃথিবীর অনন্ত আসক্তির আড়ম্বর, তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিতনা। তিনি সকল বাধাকে পরাভূত করিয়া, নীরবে আপনার ধ্যানের বস্তুকে লইয়া, জনসমাজের বক্ষের উপরই নির্জ্জন ত্যাগীর জীবন যাপন করিতেন; এইটুকুই ছিল, তাঁহার স্বভাবের অতিমহান্ বিশেষত্ব,—যাহা বহু যোগিজনের পক্ষেও একান্ত সহজসাধ্য ছিলনা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গীতায় ভগবান্, জপ-কর্ম্মকে, সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই জপ-যজ্ঞ যে ভগবানের স্বরূপ তাহাও বলিয়াছেন; তারকনাথ আপনার শেষ জীবনের অহোরাত্র-সমূহ, এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে একমাত্র জপকর্ম্মই তাঁহার করণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্য সকল কর্ম্মকেই, তিনি, এই একমাত্র কর্ম্মে পর্য্যবসিত করেন; অহোরাত্র নাম জপ করিতে, করিতে, আপনাপনিই তাঁহার বিষয়ে ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়;—সংসারে অবস্থান করিতেন, কিন্তু উহাতে একান্ত নির্লিপ্তই থাকিতেন; ঈশ্বর-চিন্তনই এই সময় তাঁহার চিত্তের আরামদায়ক কর্ম্ম ছিল,—তাঁহার সকল কামনা স্বতঃই তিরোহিত হইয়াছিল,—ভগবানের উপর সকল কর্ম্মের ফলভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত-মনে আপনার অন্তিমকালের প্রতীক্ষায়, তিনি আপনার শেষ দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিলেন; এমন সময় যদিও তাঁহার ঐহিক কামনা কিছুই ছিলনা, তথাপি যে সকল দান ও ধর্ম্ম মূলক কার্য্য তিনি করিতেন, তাহাও পরকালে সদ্গতির নিমিত্ত, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

তিরোধান।

এইভাবে একমাত্র অন্তিমকালের অপেক্ষাতেই যখন তিনি অবস্থান করিতে ছিলেন,—তখন সহসা একদিন,

তাঁহার একটী প্রিয়জন,—যেন মৃত্যুর পরপারের সেই অজ্ঞেয় রাজ্যে, তাঁহার শান্তিময় আবাসের আয়োজন করিবার জন্যই, লোকান্তরিত হ'ন। এই প্রিয়জনটীই ছিলেন তাঁহার একমাত্র পৌত্রী; সন ১২৯১ সালের মধ্যভাগে, তিনি সহসা অকালে পরলোক গমন করেন। ইঁহার শোক অতিমাত্র অবসাদের কারণ হইলেও, ইহাতে তারকনাথের বিষয়-বৈরাগ্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার পর, মাত্র, ছয় মাস তিনি জীবিত ছিলেন; এই বৎসরেরই শেষাংশে, তিনি আপনার সময় আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন। আপনার প্রিয় অনুচর রামহরির নিকট, তিনি এই কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক, বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বৈদ্যনাথ ধাম যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন যেওনা, গেলে আর দেখা হবেনা।" কিন্তু কালীকৃষ্ণের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায়, তিনি কিছুদিন ঘুরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়া পড়েন; চৈত্র মাসের প্রথমে কোন এক রবিবার দিবস, তারকনাথ সহসা অসুস্থতা অনুভব করেন;—ঐ দিবসও তিনি প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী,দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের পদধূলি অক্লেশে গ্রহণ করিতে সমর্থ হ'ন। কিন্তু তৎপরদিন, অর্থাৎ সোমবার দিবস, উক্ত সংখ্যক ব্রাহ্মণের পদরজঃ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম বোধ করিতে থাকেন;—যে

ব্রাহ্মণ-চরণরেণু মস্তকে ধারণ, তাঁহার সর্ব্বোত্তম দৈনন্দিন প্রিয়কার্য্য ছিল, যাহা তিনি এ যাবৎ বিনা ক্লেশে, আপনার অন্তর্নিহিত ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াই, সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন,—যে কার্য্য তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহা সম্পন্ন করিতে জীবনের কোন দিনই, তিনি অবসাদ বোধ করেন নাই, সহস্র অসুবিধা ও অসুস্থতার মধ্যেও, যাহা নির্ব্বিবাদে নিষ্পন্ন করিয়া ছিলেন, আজ তাহা করিতে ক্লেশ অনুভূত হওয়ায়, তিনি সংশয়াকুল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে হইল, এ যাত্রা আর রক্ষা নাই, তাঁহার অন্তিম সময় আসন্ন।

আত্মীয়গণ তদীয় মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, হতাশায় ব্যাকুল হইলেন, ও তাঁহারা সমবেত হইয়া, আপাত-কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন। একপক্ষ মত দিলেন, "কর্ত্তা বৃদ্ধ, তাহার উপর অসুস্থতা, কখন কি হয়, বলা যায় না, তাই কালীকৃষ্ণকে সত্বর আনিবার ব্যবস্থা হউক।" অপর পক্ষ বলিলেন, "সামান্য অসুস্থতায় ভীত হইবার কিছু নাই,—বিশেষতঃ কালীকৃষ্ণ, মাত্র সেদিন, বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছেন, তাঁহাকে তাড়াতাড়ি আনিবার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি ঠিক সময়ে আপনিই আসিয়া পড়িবেন,—তাঁহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইতে হইবেনা।" প্রথম পক্ষ ঐ প্রকার মতে আদৌ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহারা যথাসম্ভব সত্বর একমাত্র



শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস প্রামাণিক

পুত্র, কালীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, কয়েকজনকে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যথা সময়ে কালীকৃষ্ণ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পরমারাধ্য পিতৃদেবের শয্যাপার্শ্বে গমন করিলেন ; তারকনাথ ইতিমধ্যেই, আপনার আসন্নকালের আর বিলম্ব নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া, আত্মীয়-গণের নিকট তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন ;—কালোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন বিষয়েও তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া, স্বীয় অভীষ্ট দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই, সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আপনার একমাত্র পুত্রও, যখন তাঁহাকে "বাবা, বাবা" বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখনও তিনি তাঁহার অভীষ্ট দেবের ধ্যান হইতে, সামান্য মাত্রও বিচলিত হইলেন না, পুত্রের কাতর আহ্বান তাঁহাকে কিছুমাত্র বিগলিত করিতে পারিলনা, তিনি একবারও আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিলেন না। পুত্রের মনে হইল, পিতার অমতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই, পিতা অভিমানে উত্তর দিতেছেন না,—কিন্তু তাঁহার ধারণা ভুল ;—যিনি চিরদিন সংসারে একান্ত নির্লিপ্ত থাকিয়াই, ধরণীর গণা দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া যাইতেছিলেন, তিনি অন্তিমে, জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে, আর পৃথিবীর মায়া জড়িত না হইয়া, আপনার চির সাধনার ধনকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, তাঁহার ক্ষণিক বিরহও সহ্য করিতে অভিলাষী না হইয়াই, ইহ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আপনার একমাত্র আত্মজের আহ্বানকেও

উপেক্ষা করিলেন। মায়া ছলনাময়ী, অনেক যোগী ঋষিও সহজে মায়ার ছলনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না; বহু জন্মান্তরের সাধনার ফলে জীবন্মুক্ত পুরুষগণই কেবল মায়ায় জড়ীভূত থাকিতে অভিলাষ করেন না। এই মায়ার অমানুষীশক্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করা, মহাবীরত্বের লক্ষণ, তাই, এই মোক্ষত্ব-সূচক কার্য্য প্রকাশ করিয়া, তারকনাথ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইলেন, এবং তাহার মন যে পৃথিবীর কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাহা প্রমাণিত করিলেন।

ক্রমে আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইল, আত্মীয়গণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সজ্ঞান অবস্থাতেই তীরস্থ করাইবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। রাত্রিশেষে, তাঁহাকে পুণ্যপ্রবাহিনী ভাগীরথির তটভূমিতে লইয়া গিয়া, আত্মীয়বর্গ সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেন;— অবিরাম নাম-কীর্ত্তনে তাঁহার স্বভাবত তদগতচিত্ত, আরও গভীরভাবে পরমার্থ বিষয়ে মগ্ন হইল, এমত সময়ে পূর্ব্বদিক্-চক্রবালে অরুণরাগ-লেখা দৃষ্টিগোচর হইবার সমকালেই, তাঁহার অবিরাম ভগবচ্চরণে নিবদ্ধ নয়নযুগল, স্পন্দনহীন হইয়া আসিল, এবং নিরন্তর উপাংশু-জপ-নিরত রসনা নিশ্চল ভাব ধারণ করিল, আত্মীয়গণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আত্মা নশ্বর কায়া পরিত্যাগ করিয়া, পরমাত্মায় লীন হইতেছেন। ললনাগণের রোদন-ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া,

ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের নির্ঘোষ নভস্তলে নিনাদিত হইতে লাগিল। ৭ই চৈত্র ঊষাকালে, তিনি ইহধাম হইতে তিরোহিত হইলেন। সংকারের সকল আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল,—অনন্তর প্রজ্জ্বলিত চিতার ধূমকুণ্ডলী গগনমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল,—ভগবান্ তপনদেব সহসা পরিবেষবিভূষিত হইয়া উদিত হইলেন;—যতক্ষণ চিতা জাজ্জল্যমান ছিল, ততক্ষণ ঐ পরিবেষ গগন-গাত্রে অবস্থান করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাপনের সঙ্গে সঙ্গেই; অন্তর্হিত হয়;—ইহা দেখিয়া ভাবুকগণ কল্পনা করেন যে, ঐ মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া বৃন্দারকগণ পরমভক্তকে আপনাদের রাজ্যে, প্রত্যুদ্গত করিয়া লইতেছেন; সুকবি অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় উক্ত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া, একটী সুন্দর কবিতা রচনা করেন;—সেই সুদীর্ঘ কবিতাটী, "সূর্য্য-মণ্ডল" নামে, তাঁহার রচিত কবিকুঞ্জ নামক পুস্তকে, মুদ্রিত হইয়াছে। রসগ্রহণেচ্ছু পাঠক, উক্ত পুস্তকে তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। দাহান্তে তাঁহার দেহাবশেষ যথাবিধি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর যথাকালে মহাড়ম্বরে তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ, উপযুক্ত ভাবে, পিতৃ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে, কিছু মাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

যাঁহার জন্মে কুল পবিত্র, ও জননী কৃতার্থা হ'ন, তিনিই প্রকৃত সুসন্তান। সুগন্ধ কুসুম যুক্ত একটীমাত্র বৃক্ষও, যেমন

স্বীয় গন্ধে, সমগ্র-কানন-ভূমিকে আমোদিত করে, একমাত্র সুসন্তানের দ্বারাও, তেমনই সমগ্র বংশ, জাতি, ও দেশ গৌরবান্বিত হয়।

উপসংহার।

তারকনাথ কেবল মাত্র স্বীয় বংশের গৌরব নহেন; তাঁহার দ্বারা তদীয় জতি ও দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে। কংসকার জাতীয় ব্যবসায়িগণ অনেকে,বৎসরের প্রথম দিন,শ্রদ্ধার সহিত আপনাদের খাতায় তাঁহার নাম লিখিয়া, শুভ বৎসরের পত্তন করেন। প্রাতঃকালে তাঁহার পুণ্য নাম স্মরণ করা তদীয় স্বজাতি-মহলে, অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া, বিবেচিত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস তদীয় পূত নাম স্মরণে, সেইদিন সুখে অতি বাহিত হইবে। নশ্বর পৃথিবী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনের ক্ষেত্র; জীবনের স্তর বিশেষে, মনুষ্যকে, এই চতুর্ব্বর্গের, এক একটীর সাধনায়, সফলতা লাভ করিতে হয়। যৌবন কালে, মনুষ্যকে যেমন অর্থ ও কাম সাধনা করিয়া, কৃতী হইতে হয়,তেমনই ধর্ম্ম সাধনাও ঐ সময় হইতেই আরম্ভ করা উচিত; কারণ শাস্ত্র বলেন "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ,অনিত্যং খলু জীবিতম্। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যু-কালো ভবিষ্যতি।" জীবনের যখন কোন নিশ্চয়তাই নাই, তখন যৌবনাবধিই ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য;—বৃদ্ধাবস্থা মোক্ষ-সাধনার সময়; তারকনাথের জীবন, এই চতুর্ব্বর্গ সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক্ স্বরূপ। তাঁহার তিরোধানে আমরা প্রকৃত-বঙ্গীয়-হিন্দুর যে আদর্শটিকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার স্থান, যুগ যুগান্তেও

পূর্ণ হওয়া কঠিন ; কিন্তু ভাগীরথির পুণ্যধারা যেমন অনাদি কাল হইতে, পূতসলিল-ধারা বহন করিয়া আসিতেছেন, তেমনই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত তদীয় বংশজগণ, আবহমান কাল ধরিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাব-প্রবাহ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন,—ইহাতেই আমাদের সান্ত্বনা ; এই প্রবাহের অন্তরেই আমরা যুগযুগান্ত ধরিয়া, তাঁহার সেই মহাপ্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়া, অনুপ্রেরণা লাভ করিব। এই প্রবাহের মধ্যেই, অনাগত কাল ব্যাপ্ত করিয়া, এই নশ্বর জগতে তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা অমরত্ব লাভ করুন। সম্প্রতি কলিকাতা বাসি-নাগরিক গণের যত্নে, তদীয় বাটীর সম্মুখস্থ পথটী তাঁহার নামে উল্লিখিত হওয়ায়, তাঁহার স্থায়ি-স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক।

১২৪৯ সালে তারকনাথের একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি চিরদিন অজীর্ণ-পীড়ায় আক্রান্ত থাকিলেও, প্রাতঃস্মরণীয় পিতার তিরোধানের পর যথাযোগ্য দক্ষতার সহিত, বিস্তৃত ব্যবসায় পরিচালনা করেন। নদীয়া জেলার

কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক

ধর্ম্মদা মোকামে, তিনি বাসন প্রস্তুতের একটী কারখানা ক্রয় করিয়া, ব্যবসায় বর্দ্ধন করেন। তাঁহার আমলে পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ধনোৎপাদন ক্ষমতা, পূর্ব্ববৎ না না থাকিলেও, তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ একই ভাবে পৈত্রিক কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করেন। ৺লোকনাথ কুণ্ডুর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; তুইজন সাধু-মহাত্মার কৃপালাভ করিয়া তিনি চারিজন পুত্রের অধিকারী হ'ন, ঐ সাধুদ্বয়ের অন্যতম ভূতানন্দ স্বামী বলেন,—এই চারিপুত্র চারিজন তারকনাথ হইবেন। তাঁহার বাণী কতকাংশে সত্য, কারণ, পৌত্রগণ তাঁহাদের পিতামহের কীর্ত্তিরক্ষা বিষয়ে আজীবন যত্নশীল। কালীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সাধন-ভজনে রত থাকিতেন; তাঁহার জীবদ্দশাতেই তদীয় জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও মধ্যম পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পরলোক গমন করেন। অম্লান-বদনে তিনি তুর্ব্বহ-পুত্র-শোক ভার সহ্য করেন। এই সময় কেহ কেহ, তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টাকরায়, তিনি স্বীয় জপমালা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর, তিনি স্বয়ং, তদীয় কার্য্যভার গ্রহণে উত্তম প্রকাশ করিলে, তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া, আপনারাই সেই কার্য্যভার পরিচালনা করিতে থাকেন। স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর, প্রায় কুড়ি বৎসর জীবিত থাকিয়া, এই ঈশ্বরানুরাগী পুরুষ ১৩১২ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক

১২৭৩ সালে মহাত্মা কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ্যপুত্র, মহানুভব আশুতোষ প্রামাণিক মহাশয়, জন্মগ্রহণ করেন ; কলিকাতা সংস্কৃত কলি-জিয়েট্ স্কুলে, ইনি বিদ্যা-শিক্ষা করেন,—উক্ত বিদ্যালয়ে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠ-সমাপ্তির পর, ইনি পিতার ব্যবসায়ে প্রবেশ করিলেও, অধ্যয়ন-চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই। অবসর-প্রাপ্ত সবজজ সুপণ্ডিত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইংরাজী, বেণীমাধব শাস্ত্রী ও গণপতি বিদ্যানিধির নিকট সংস্কৃত, ও ত্র্যম্বক মুন্সীর নিকট উর্দ্দু ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়া, ইনি আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহার গ্রন্থাগার বিবিধ পুস্তক-রত্নে সুমণ্ডিত ছিল। পুরুষানুক্রমিক বদান্যতা ইঁহার স্বভাবজাত সদ্‌গুণ ছিল। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে, অবিলম্বে দানকার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, ইনি, আপনার প্রিয় সহাধ্যায়ী, ও অবিরাম পার্শ্বচর প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট, নিরবচ্ছিন্নভাবে চারিশত মুদ্রা গচ্ছিত রাখিতেন। ইনি আজীবন বিদ্যোৎসাহী ও বিবিধ-গুণরাজি-বিভূষিত ছিলেন। শ্যামবাজার রাজ-রাজেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, ইঁহার বদান্যতার পুরস্কারস্বরূপ একটী মঙ্গলকামনাসূচক, সুচিত্র-শোভিত

মহানুভব আশুতোষ, মন্মথনাথ, বিনোদবিহারী প্রামাণিক।

মহানুভব আশুতোষ, মন্মথনাথ, বিনোদবিহারী প্রামাণিক সংস্কৃত-শ্লোক দ্বারা, ইঁহাকে অভিনন্দিত করেন। উক্ত শ্লোকটী ইঁহাদের বাটীর দেওয়াল-গাত্রে এখনও লম্বিত আছে। ইনি কোনদিনই নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না।—একবার প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের কোন প্রশংসার কথা, সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইলে, তিনি পরমানন্দে তাহা আশুতোষের কর্ণগোচর করিবামাত্র,—আশুতোষ অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁহাকে তিরস্কার করেন, ও আত্মপ্রশংসাপ্রকাশের অনিষ্টকারিতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তদবধিই গোস্বামী মহাশয় নাম ও যশের অভিলাষ পরিহার করেন;—এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, সন ১৩১০ সালে, মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে স্বীয় পিতার জীবদ্দশাতে, আপনার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস প্রামাণিক মহাশয়কে রাখিয়া, অকালে পরলোক, গমন করেন।

আশুতোষের মধ্যমভ্রাতা মন্মথনাথ, ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া, কলিকাতা হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন; ইনি সঙ্গীতপ্রিয় ও স্বয়ং বাদ্যকার ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, ইনি স্বীয় পুত্রদ্বয় কানাই লাল ও সুবল লালকে রাখিয়া, পরলোক গমন করেন, পুত্রদ্বয়ও অল্পকাল পরে ইঁহার অনুগমন করেন।

আশুতোষের চতুর্থ ভ্রাতা বিনোদবিহারী ১২৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন; মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন ও হেয়ারস্কুলে, ইনি প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইনি অতি

প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক

অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক ছিলেন। ইঁহার দুইটী বিবাহ, —প্রথমা স্ত্রী, চণ্ডীচরণ দাসের ও দ্বিতীয়া স্ত্রী, শ্যামাচরণ দাঁর কন্যা। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় ৫৮ বৎসর বয়সে, সন ১৩৪১ সালের ৩১শে বৈশাখ সোমবার দিবস পরলোক গমন করেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মহাত্মা কালীকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক মহাশয়, ১২৮০ সনের ৭ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে প্রবেশিকা শ্রেণীপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যু অবধি, পৈত্রিক ব্যাবসায়াদি পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। স্বীয় স্বনামধন্য পিতামহের কীর্ত্তিসমূহ ইনি যথাশক্তি রক্ষা করিতেছেন। ইনি অপুত্রক ;—একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস প্রামাণিক অন্ধের যষ্টির ন্যায় ইঁহার অবলম্বন। পরস্পর সহযোগিতা দ্বারা স্বীয় বংশ গৌরব ইঁহারা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু নানা দেশহিতকর কার্য্যে বিজড়িত ; ইনি বহুকাল ধরিয়া অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও বৃটিশ-ভারতীয়সভার জনৈক সভ্য।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস প্রামাণিক

ভগবৎ-কৃপায় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, ইনি দেশের তথা স্বীয় বংশের গৌরব বর্দ্ধন করুন। মহাপুরুষ তারকনাথের যশ ও প্রতিষ্ঠা, ইঁহাদের দ্বারা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হউক। এই মহৎবংশ ধরাধামে অবিনশ্বর ধারায় প্রবহমান থাকিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গল-সাধনব্রত পালন করুক।

মহানুভব ৺আশুতোষ প্রামাণিক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রাখালদাস প্রামাণিক, সন ১২৯৭ সালের ৯ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন; ইনি ৺তারকনাথের একমাত্র কুলপ্রদীপ; ধনিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, ইনি বিলাসী নহেন,—আপনার উন্নত চরিত্র, ও সুমধুর ব্যবহারে, সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ পূর্ব্বক, নিয়মিতভাবে পৈত্রিক ব্যবসায়াদি পরিচালনা করিতেছেন। রাখালবাবু স্বীয় খুল্লতাতের একান্ত বাধ্য, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতে অভ্যস্ত। দুঃখের বিষয় ইঁহার কোন পুত্র সন্তান নাই;—পাঁচটী কন্যাই বর্ত্তমানে ইঁহার অবলম্বন। অন্যতমা কন্যা বিশ্বেশ্বরী, ও প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগের পর, ইঁহার ধীরতা দেখিয়া, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। কেবলমাত্র বংশ রক্ষার জন্য আত্মীয়গণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ইনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। বিশ্বপিতার অসীম করুণায় ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই মহাত্মা তারকনাথের ধারা ধরাধামে বহমান থাকুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস প্রামাণিক।

পরিশিষ্ট

সমাজরূপ অঙ্গীর কংসকার (১) জাতি একটী অঙ্গ। কাংস্য নির্ম্মিত তৈজস নির্ম্মাণ ও বিক্রয় এই জাতির ব্যবসায়। কাংস্য, তাম্র ও রঙ্গের মিশ্রণজাত ধাতু বিশেষ। প্রধানতঃ কাংস্যধাতুজ-তৈজস-নির্ম্মাণ ইহাদের ব্যবসায় হইলেও, পিত্তল এবং তাম্র প্রভৃতি ধাতুর তৈজসও ইঁহারা প্রস্তুত করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, ঘৃতাচী অপ্সরা ও ঋষি বিশ্বামিত্র পরস্পর অভিশাপে, মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কিরূপে নয় জন শিল্পকার (২) পুত্র উৎপন্ন করেন, তাহা বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশে এই জাতির সমাগম কিরূপে হইল? ইঁহারা থাক বা শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভক্ত কেন? নবশাখ বা পঞ্চবণিক এই দুইয়ের কোনটির অন্তর্গত এই জাতি? এই সকল

(১) কংসকার—কংসং তন্ময় পাত্রং করোতি কৃ+অন্ উপ, সঃ। (কাংসারী) বর্ণসঙ্কর জাতিভেদে। বাচস্পত্যাভিধান ১৬০৩ পৃষ্ঠা।

(২) বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ। ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ। মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকাঃ। কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥ ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৯-২০

সমস্যা এখনও কোন বিশেষজ্ঞ পূরণ করেন নাই। পৌরাণিক মতবাদ (৩) অনুসরণ করিলে, ইহাদিগকে নবশাখ ও পঞ্চ-বণিক দুই বলা যায়। পুরাণে, কংসকার-উৎপত্তির আরও দুই কারণ উল্লিখিত আছে (৪)। বহির্বঙ্গে কংসকারগণ বৈশ্য, ও উপবীত গ্রহণাধিকারী,—বঙ্গদেশে ইঁহারা জলাচরণীয় সৎশূদ্র (৫)। এদেশেও কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে, ইঁহাদের কুশের উপবীত ধারণের রীতি আছে। জনৈক বৃদ্ধ বলেন, সেই সময় প্রাচীনাগণ একটী কবিতা (৬) আবৃত্তি করেন। বঙ্গদেশে কংসকারগণ, সপ্তগ্রামী, মামুদপুরী বা মামদাবাদী, মাহিনগরী, মাইতি বা মাহিতা নামক চারিটী থাক বা ঘরে বিভক্ত;—মামদাবাদী শ্রেণী কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য—

(৩) বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক্। কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ॥ বৃহ, পু॥ তৈনৈতস্যাম্বষ্ঠবৎ দ্বিজসংস্কার ইতি কিন্তু সা জাতি দেশান্তরে প্রসিদ্ধা।

(৪) গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংসিকো মণিকারকঃ। সুবর্ণবণিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজঃ স্মৃতাঃ। শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতাস্তাম্রকাংস্যোপজীবিকাঃ॥

(৫) গৌড়দেশবাসিনস্তু শূদ্রাঃ।

(৬) যোগী ঋষি বেশ ছাড়ো গো। গৃহীধর্ম্ম বেশ ধর গো॥

সপ্তগ্রামী ও মাহিতা শ্রেণীর কংসকারই এখানে অধিক। মাহিনগরী শ্রেণীর কংসকার বর্ত্তমানে দুর্ল্লভ। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন; এই জাতি, বঙ্গদেশে প্রথম আসিয়া যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের নামেই, ইঁহাদের শ্রেণী বা থাকের নাম হইয়াছে। সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায়, মাহিতা বা মাহাতা গ্রাম বর্দ্ধমানে, অপর দুইটী গ্রামের স্থান নির্ণয় দুরূহ। সপ্তগ্রামীর গোত্র ঃ—কাশ্যপ, দধিঋষি, শাণ্ডিল্য, মধুকুল্য, হৃষীকেশ; উপাধি ঃ--দত্ত (১২ ঘর), দাস (১৩ ঘর) নন্দন, গুঁই, নন্দী, দে, দাঁ ইত্যাদি। মাহিতা শ্রেণীর গোত্র ঃ—শঙ্খঋষি, শাণ্ডিল্য, সপ্তবার্ষি, হৃষীকেশ ও দধিঋষি,। উপাধি—কুণ্ড, প্রামাণিক, দাস, দাঁ ও পাল প্রভৃতি। বর্ত্তমান যুগে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়ায়, অনেক জাতিই আপনাদের নিজবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, পরবৃত্তির আশ্রয় করিয়াছেন।

গ্রন্থোল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—পিতা নন্দলাল সিংহ—প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ। জন্ম যোড়াসাঁকো পল্লীতে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে; সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলা ভাষাবিদ্। দুই বিবাহ, বঙ্গ ভাষায় বহু নাটক অনুবাদ ও বহু পুস্তক রচনা করেন—প্রসিদ্ধ পুস্তক "হুতোমপেঁচারনক্সা"। লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে

মহাভারত অনুবাদ করাইয়া, বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। মৃত্যু ১৮৭০।২৪ শে জুলাই। ইঁহার স্ত্রী ৺বলাইসিংহের পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণপান্তি—রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা; জন্ম ১১৫৬ সাল। পিতা সহস্ররাম পাল—আড়ংঘাটার মোহান্ত গঙ্গারামের নিকট স্বল্প মূল্যে ছোলা ক্রয় করিয়া, প্রথম ৫০০০৲ মুদ্রা লাভ করেন। ক্রমে কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী হইয়া উঠেন। ইঁহার সত্য-প্রিয়তা ও বদান্যতার বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মৃত্যু ১২১৬ সাল।

কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ঃ—জন্ম ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শ্যামবাজারে, মাতুলালয়ে; পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, হেয়ার স্কুল ও হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ; Derojio ভক্ত। ১৮৩২।১৭ই অক্টোবর ডফ্ সাহেব কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত। ১৮৩৭ হইতে ২৫ বৎসর খ্রীষ্টীয় আচার্য্য; বহু ভাষাবিদ—রঘুবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্য। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার—D. L. ও C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত। হেয়ার স্কুল ও বিশপস্ কলেজের শিক্ষক। হেদুয়ার কৃষ্ণবন্দ্যোর গীর্জ্জার প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু ১৮৮৫।১১ মে।

কৃষ্ণদাস পালঃ—জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে; ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষালাভ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে British Indian Association এর সহকারী

সম্পাদক পদলাভ। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক। বিখ্যাত বাগ্মী। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রায়বাহাদুর, ও পর বৎসর C.I.E. উপাধি লাভ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বহুমূত্র রোগে মৃত্যু।

ডিরোজিও হেনরী লুইভিভিয়ান :—জন্ম ১৮০৯। ১০ই এপ্রিল কলিকাতার ইটালীতে। পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও কলিকাতার ব্যবসায়ী; ধর্ম্মতলার ড্রমণ্ডস্ একাডেমিতে শিক্ষা-লাভ। ১৪ বৎসর বয়সে শিক্ষাত্যাগ ও ব্যবসায়ে প্রবেশ। ১৮ বৎসর বয়সে কবিতা প্রকাশ ও হিন্দু-কলেজের ৪র্থ শিক্ষক পদে নিযুক্তি। সাধারণের আবেদনে ছাত্রগণকে কুপথগামী করিবার অজুহাতে, তিন বৎসর পরে কার্য্য ত্যাগ। ১৮৩১।২৩ ডিসেম্বর বিসূচিকায় মৃত্যু।

দয়ানন্দস্বামী :—কাঠিয়া বাড়ে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। যৌবনকালে সন্ন্যাস গ্রহণ; আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা; অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। ধর্ম্ম সংস্কারক। ১৮৮৩।৩০ অক্টোবর আজমীরে মৃত্যু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর :—মহর্ষি; পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার যোড়াসাঁকো বাটীতে; ১৮৪৩ অব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ। ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক; কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জনক; ১৯০৫।১৯ শে জানুয়ারী তিরোধান।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—পিতা রামলোচন ঠাকুর; জন্ম ইং ১৭৯৪ খ্রীঃ। রামমণি ঠাকুরের দত্তকপুত্র। বিস্তৃত ব্যবসায়,

ব্যাঙ্ক ও জমিদারীর মালিক। ইউরোপ ও ভারতে প্রিন্স নামে খ্যাত। ইনি দুইবার ইউরোপ গমন করেন। প্রবাদ ইঁহার দৈনিক আয় লক্ষ মুদ্রা ছিল। তিন পুত্র রাখিয়া ১৮৪৬ খ্রীঃ বিলাতে লোকান্তরিত হ'ন।

প্যারী চাঁদ মিত্র—পিতা রামনারায়ণ মিত্র। জন্ম সন ১২২১ সালে কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে। বাংলা, পারসী ও ইংরাজী ভাষাবিদ্। "আলালের ঘরের দুলাল" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। পাব্লিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান—"মাসিক পত্রিকা" নামক পত্রিকা সম্পাদক। প্রেততত্ত্ব আলোচক। স্ত্রীর প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথনকারক। ইং১৮৮২।২৩শে নভেম্বর মৃত্যু।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র—স্বনামধন্যপুরুষ। জন্ম হুগলী জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে (বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলায়) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

বিবেকানন্দ স্বামী :—বিখ্যাত ব্যক্তি। জন্ম ১৮৬৩; মৃত্যু ১৯০২; চিকাগো ধর্ম্ম-সভা-জয়ী।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৭৪৭ শকাব্দা বা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার হরিতকী বাগান পল্লীতে। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা-লাভ। বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক। প্রথম অস্থায়ী Director of Public Instruction. স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক—বহু পুস্তক প্রণেতা। বিশ্বনাথ

ফণ্ডে লক্ষমুদ্রাদাতা। উপযুক্ত পুত্রগণের জনক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

মতিলালশীল—পিতা চৈতন্য চরণ শীল। জন্ম কলিকাতায় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে। বাং ১১৯৮ সালে সাহেবদের জাহাজ কোংর মুচ্ছুদ্দী। কর্ক ও বোতলের ব্যবসায়ে ধনী। বিখ্যাত দাতা; বেলঘরিয়া অন্নসত্র ও শীলস্ ফ্রী কলেজ (১৮৪২) প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। ৪ পুত্র, হীরালাল, পান্নালাল, চূণীলাল, কানাই লাল।

রাধানাথ সিকদার :—জন্ম যোড়াসাঁকো সিকদার পাড়ায়, ইং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে—সরকারী জরিপ বিভাগে প্রবিষ্ট প্রথম ভারতবাসী। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। বিভাগীয় কর্ত্তার নামে উহার নামকরণ হয়। বিভিন্ন সারভেয়ারজেনারেলের প্রশংসাভাজন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিকোণমিতি জরীপ বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ। গোন্দলপাড়া বাগান বাটীতে ১৮৭০।১৭ই মে মৃত্যু।

রামগোপাল ঘোষ :—জন্ম কলিকাতায়, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। ডেভিড হেয়ারের সাহায্যে হিন্দু কলেজে প্রবেশ। উচ্চ শিক্ষালাভ। বিখ্যাত বণিক। কেলসন ঘোষ এণ্ড কোংর মালিক; জ্ঞানান্বেষণ ও spectator সম্পাদক। বিখ্যাত বক্তা ও দাতা। নিমতলা শ্মশানে কলে শবদাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার প্রচেষ্টা, ইঁহার

বক্তৃতাতেই বন্ধ হয়। লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৬৮। ১৫ই জানুয়ারী মৃত্যু।

রামদুলাল সরকার:—বর্গীর ভয়ে পলায়ন কালে, দমদমার নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ-প্রান্তরে, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতা বলরাম সরকার। হাটখোলার মদনমোহন দত্তের নিকট কর্ম্মকালে লক্ষ মুদ্রা লাভ। বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ী; ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া, ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

রামচন্দ্র দত্ত:—পরমহংস রামকৃষ্ণ ভক্ত, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান প্রতিষ্ঠাতা।

লালাবাবু:—বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, ১৮৩০ খ্রীঃ উড়িষ্যার দেওয়ান। কলিকাতায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা। ধীবর কন্যাগণের "বেলা গেল পারে যাবি চল" কথা শুনিয়া বৈরাগ্য হওয়ায়—মথুরায় বাস করেন—সেখানে ২৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, অন্নদানের জন্য বার্ষিক ২২ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। গোয়ালিয়রের রাণীর ঘোড়ার ক্ষুরে মৃত্যু। স্ত্রীর নাম কাত্যায়নী, পুত্র শ্রীনারায়ণ, দত্তক প্রতাপ ও ঈশ্বরচন্দ্র।